# রবীন্দ্র উপন্যাসে সমাজদ্বন্দ্ব

অরূপ কুমার দাস

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
২০১৩

# রবীন্দ্র উপন্যাসে সমাজদ্বন্দ্ব

অরূপকুমার দাস

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

২০১৩

Rabindra uponnase samajdwando
A collection of essays on the novels of
Rabindranath Tagore



প্রকাশ কাল : জানুয়ারি, ২০১৩

প্রচ্ছদ : প্রসেনজিৎ মহাপাত্র

নিবন্ধক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৮৭/১, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭৩ থেকে
প্রকাশিত এবং শ্রীপ্রদীপকুমার ঘোষ, সুপারিনটেন্ডেন্ট,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ৪৮, হাজরা রোড,
কলকাতা - ৭০০ ০১৯ হতে মুদ্রিত।

Regd. No. 2700B.

মূল্য — ৫০/- মাত্র।

# প্রাক্‌কথন

রবীন্দ্রনাথের সার্ধশত জন্মবর্ষ পালনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে যখন নানান বৌদ্ধিক চর্চা এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠিত হচ্ছিল, তখন ০৭.০৩.২০১১ তারিখে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক সুরঞ্জন দাস মহাশয়ের কাছে আমার লেখা রবীন্দ্র উপন্যাস বিষয়ক ছ'খানা প্রবন্ধকে একটা গ্রন্থে সংকলিত করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনার দ্বারা প্রকাশের জন্য আনুকূল্য প্রার্থনা করি। মনে ছিল এই একমাত্র ক্ষুদ্র আশা যে, তাহলে 'লেখাগুলি বিচ্ছিন্নতা ও বিস্মৃতি থেকে রক্ষা পেতে পারে'। এজন্য বিধিগতভাবে আবেদন করার ক্ষেত্রে যা করা উচিত তাও করি। বিভাগীয় প্রধানের মধ্যবর্তিতা অবলম্বন, সেই সূত্রে বিভাগীয় সমিতির সম্মতি ও তারপর মাননীয় উপাচার্য মহাশয় সমীপে আবেদন উত্থাপন। প্রথম আবেদনটি গ্রহণ করার পর তা কাগজের স্তূপে হারিয়ে যাওয়ায় উপাচার্য মহাশয়ের কার্যালয় তা পুনরায় প্রমান্য নথি হিসেবে ২৮ এপ্রিল ২০১১ তারিখে গ্রহণ করে। এরপর আশায় আশায় দিন কাটে, ভাবি; নিশ্চয়ই প্রক্রিয়াগত অগ্রগতি চলছে। কিন্তু লাল কাঁকড়ার দ্বীপে নেপথ্যে যে এই প্রস্তাবটাকে সূচনা থেকেই গলা টিপে মারার কুচক্রী খল শঠতা শুরু হয়ে গেছে এবং তা বেশ কুটিল পদ্ধতিতে নখরাঘাত করেছে এই গ্রন্থটির প্রকাশ করার প্রস্তাবে; তা বুঝতে পারি প্রায় বছর ঘুরে যাবার প্রাক্কালে ২৭.০৩.২০১২ তারিখে আবার মাননীয় উপাচার্য মহাশয়কে একটা চিঠি লিখে বিষযটা কোন অবস্থায় আছে জানতে চেয়ে সাক্ষাত করার পর। তিনি তাঁর কার্যালয়ের 'ইস্যু রেজিস্টার'-এর ১১৫ পৃষ্ঠা থেকে দেখান যে ০৯.১২.২০১১ তারিখে তিনি যথাযথ স্থানে প্রস্তাবিত গ্রন্থটির জন্য আমার প্রদত্ত প্রবন্ধগুলির মুদ্রণযোগ্যতা বিবেচনার জন্য বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠাতে অনুরোধ করেছেন। সেই কার্যালয়-আদেশ গ্রহণও করা হয়েছে, কিন্তু তার পর থেকেই বিষয়টি সাড়ে তিন মাস ধরে 'চেপে দেওয়া' হয়েছে। অথচ খুব সূক্ষ্মভাবে কৌশলী প্রচারের জন্য এমন কথা ছড়িয়ে দেওয়া হয় যে : আমার প্রস্তাবের উপস্থাপনাটা খুব অগোছালো, দেওয়া জেরক্স-প্রতিলিপিগুলোতে কোন কোন পাতায় অন্য লেখকের অন্য প্রবন্ধ-সূচনা বা সমাপ্তির অর্দ্ধেক পাতাও না-কাটা অবস্থায় বিরাজ করছে, কোন সূচিপত্র দেওয়া হয়নি . . . ইত্যাদি। এই চর্চা ও কূট প্রচার যার দ্বারা সংঘটিত হচ্ছিল তাকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করতে থতমত হয়ে মিথ্যাচারের মুখ-মুখোশ আরক্ত করে কপট অস্বীকার করে। বুঝতে পারি, এই প্রবন্ধগুলোকে গ্রন্থরূপ দেবার ভাবনাটাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করতে নেপথ্যে সম্মিলিতভাবে সক্রিয় হয়েছে একাধিক শঠ কুচক্রী।

অতি সত্বর ১৩'এপ্রিল ২০১২ তারিখে মাননীয় উপাচার্য মহাশয়ের কাছে আরও তিনখানা অনুপূরক প্রবন্ধ সংযুক্ত করে আবার *নতুন করে বিবেচনা-প্রক্রিয়াটি সচল করার অনুরোধ* পত্র লিখি। এই অনুরোধপত্রে বেদনার সঙ্গে লিখতে হয়, "আপনি বিষয়টির যথাযথ গুরত্ব অনুধাবন করে তা তৎকালীন বিভাগীয় প্রধানের কাছে প্রেরণ করলেও বিষয়টি কোন কারণে দীর্ঘায়িত ও বিলম্বিত করা হয়েছে — যার ফলে আজ একবছর-একমাস পরেও আপনি কোন প্রতিক্রিয়া পাননি এবং যার ফলে আপনার পক্ষে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়নি।" মাননীয় উপাচার্য মহাশয়কে এই

মর্মে অনুরোধ জানাই যে 'নতুনভাবে বর্তমান বিভাগীয় প্রধান (সুচরিতা বন্দ্যোপাধ্যায়) মহাশয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রস্তাবিত গ্রন্থটির অঙ্কুর-বিনষ্টির অশুভ ছায়াগ্রাস থেকে রক্ষা করুন'। সেই অনুরোধ যে তিনি যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেছেন তা বোঝা গেল যখন ২৮.০৯.২০১২ তারিখে বিভাগীয় প্রধান ড. সুচরিতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়া মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক সুরঞ্জন দাস মহাশয়ের নির্দেশমত প্রস্তাবিত প্রবন্ধ সংকলনের অগ্রগতি বিষয়ে আমাকে লিখিতভাবে অবহিত করে বিশেষজ্ঞের সুপারিশ অনুযায়ী একটি প্রবন্ধ পাদটীকা ও উল্লেখপঞ্জিসহ বিস্তারিত আকারে পুনর্লিখন করে জমা দেবার কথা বলেন। তদনুসারে ০৩.১০.২০১২ তারিখে 'শতবর্ষে গোরা : অভিজাত বাঙালির অসার ধর্মকোন্দলের কথাগদ্য' প্রবন্ধটি বিস্তারিতভাবে লিখে তাঁকে প্রদান করি এবং তৎসহ লিখি, "আশা করি বিষয়টি যাতে বিলম্বিত না হয় সেই ব্যবস্থা করবেন, কেন না বিষয়টি ২০১১'র এপ্রিল থেকেই নানান প্রতিবন্ধকতার শিকার। আপনি সেই প্রতিকূলতার অপসারণ করবেন এই প্রত্যাশা।" এই অনুরোধ যে যথাযথভাবে বিবেচিত হয়েছে তা বোঝা গেল অবশেষে যখন ০৮.১১.২০১২ তারিখে মাননীয়া বিভাগীয় প্রধান মহাশয়া ডঃ সুচবিতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে ৩১.১০.২০১২ তারিখে স্বাক্ষরিত মাননীয় উপাচার্য মহাশয়ের স্বাক্ষরিত চূড়ান্ত মুদ্রণ আনুকূল্যের অনুমোদন বিষয়ে অবহিত করলেন।

গ্রন্থটির বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনার দ্বারা মুদ্রণ-সৌভাগ্য অর্জনের আনন্দ সংবাদের অবসরে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক সুরঞ্জন দাস মহাশয়কে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। তাঁর প্রতিমুহূর্তের অহংশূন্য, উদার ও শিক্ষাবিস্তারের আনুকূল্যময় সংবেদনশীল প্রশাসন-পরিচালনার নির্বাহী কর্মপ্রবণতা এর আগেও অন্য সংকট মুহূর্তে বরাভয় প্রদর্শনে অকৃপণভাবে প্রসারিত হতে দেখেছি। এই গ্রন্থের মুদ্রণ-আনুকূল্য বিষয়েও তাঁর সেই নীতিনিষ্ঠ মনুষ্যত্ব পুনরায় কার্যকর না হলে লালকাঁকড়ার স্বভাববিশিষ্ট কামটদের ধারালো দাঁতের ফাঁক থেকে গ্রন্থটির অনিবর্তনীয় অঙ্কুর-বিনষ্টি রোধ করার সাধ্য ছিলনা এই ক্ষুদ্র প্রাণীর পক্ষে।

সংকলনের প্রবন্ধগুলির মধ্যে 'চোখের বালি' বিষয়ক সন্দর্ভটি প্রকাশিত হয়েছিল ২০০২ সালে। সর্বশেষে বিস্তৃতভাবে পুনর্লিখিত 'গোরা' বিষয়ক প্রবন্ধটি। এক দশকের অধিককাল ধরে লেখা এই প্রবন্ধগুলোতে লেখকের অজ্ঞাতসারেই একটা কেন্দ্রিয় ভাবনাসূত্র তৈরি হয়ে গেছে; তা হ'ল রবীন্দ্রনাথের আলোচিত উপন্যাসগুলোতে বিধৃত সমাজদ্বন্দ্ব। তাই এর 'রবীন্দ্র উপন্যাসে সমাজদ্বন্দ্ব' নামকরণ। ২০০৯'এর ফেব্রুয়ারিতে ক্ষুদ্রাকারে 'গোরা' বিষয়ক প্রবন্ধটি পড়ে অধ্যাপক পবিত্র সরকার মহাশয় আমাকে ডেকে প্রশংসা করেছিলেন লেখাটির জন্য। এই অবসরে তাঁকেও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। প্রায় দু'বছর আগে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক সুরঞ্জন দাস মহাশয়ের কাছে প্রবন্ধগুলোর গ্রন্থরূপায়ণের আনুকূল্য চেয়ে লিখেছিলাম, "বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুল কর্মপ্রবাহের ক্ষুদ্র অংশ হিসাবে সহৃদয় আনুকূল্য প্রদান করে বাধিত করবেন।" আজ সেই শুভক্ষণ সমাগত। বর্তমান বিভাগীয় প্রধান ডঃ সুচরিতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে কেতাবি বঙ্গভাষা ও সাহিত্য চর্চার ক্লিশে পরম্পরা ভেঙে একের পর এক বিভাগের দৈনন্দিন সঞ্চালনায় ছাত্রছাত্রীদের পাঠক্রম বহির্ভূত

প্রতিভা প্রদর্শন ও সাংস্কৃতিক সচলতার নিয়ত স্পন্দনকে ধারণ করে রেখেছেন, তাতে ইতোমধ্যেই তাঁর নিরপেক্ষ ও সদর্থক সংবেদনশীলতা প্রমাণিত। এই গ্রন্থটিকে লাল কাঁকড়ার গর্ত থেকে বের করে আনার ক্ষেত্রে তাঁর সাহসী আনুকূল্যকে কুর্নিশ জানাই।

আশুতোষ শিক্ষাঙ্গন
০৯.১১.২০১২

**অরূপ কুমার দাস**
অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর
*বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ*
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

রবীন্দ্রনাথকে দেবত্বে ভূষিত না করে তাঁর সাহিত্যকে একজন রক্তমাংসের মানুষের লেখা বিবেচনায় যাঁরা রবীন্দ্রসাহিত্যের চর্চায় নিয়োজিত থাকার সাহস দেখিয়েছেন বিপরীত স্রোতে উজান সাঁতরে; তাঁদের মনোবলকে।

# সূচীপত্র

# রবীন্দ্র উপন্যাস : স্পন্দিত কালের সমাজদ্বন্দ্ব

তিন দশকে পাঁচটা সামাজিক উপন্যাস লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ, যেগুলো বর্ণিত কালের স্পন্দিত সমাজের ইতিহাসকে অনেকাংশে ধারণ করে রেখেছে। উপন্যাসের লেখক এবং তাঁর কাহিনি প্রকাশকালে তৎকালীন পাঠক যে পৃথিবীতে বাস করেছেন বা করেন, তার পরিবেষ্টনীর সমস্যার প্রতি সংস্পৃষ্ট থেকে বাস্তবতাকে সত্যানুগতভাবে ব্যক্ত করতে চেয়ে মানব-চরিত্র অধ্যয়ন করে তাকে কথারূপ দিলে যথাযথ সমাজদ্বন্দ্ব বিধৃত হয় আখ্যানে। এই বিচারে তাঁর 'চোখের বালি' (১৯০২), 'গোরা' (১৯০৯), 'চতুরঙ্গ' (১৯১৬), 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬) এবং 'যোগাযোগ' (১৯২৯) নিবিষ্ট অধ্যয়ন দাবি করে। অনেকক্ষেত্রে আমাদের ইতিহাস-বিমুখ জাতিগত শৈথিল্য এইসব কালমুদ্রার অর্থকে এতটাই ঝাপসা করে দেয় যে, উপন্যাসে বর্ণিত আসল সত্যকে এড়িয়ে একটা আরোপিত ভিন্নার্থ দ্যোতনা নিয়ে বছরের পর বছর অলোচনা, চর্চা, মত ও মতান্তর চলতে থাকে। ফলে এমন একটা আবহ গড়ে ওঠে, যেখানে তথ্যনিষ্ঠ 'ক্রিটিক'-এর থেকে অক্লেশ ঘুঘুধ্বনিতে সিদ্ধ এমপিরিসিস্ট মান বেশি পায়। এইসব অভিজ্ঞতাবাদীরা তাঁদের লেখায়, বলায় মোহিত করার কলা এত সুপ্রয়োগে সিদ্ধ যে বোঝা দায়, এই সাহিত্য চর্চা খেলায় একদিকে কথা বলছেন বা লিখছেন এক 'মোহন' (enchanter) এবং অন্যদিকে তা খাচ্ছে কিন্তু গিলছে না একদল 'dovecots' বা সংস্কারমুগ্ধ ঘুঘু।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে কীভাবে সমকাল বিধৃত, তা তাঁর নিজের ভাষ্যে ভাল বোঝা যায়। 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের 'পঞ্চাশোর্ধ্বম' প্রবন্ধে তিনি বলেন, ''জেনে এবং না-জেনে আমরা একদিকে প্রকাশ করি নিজের স্বভাবকে এবং অন্যদিকে নিজের কালকে। রচনার ভিতর দিয়ে আপন হৃদয়ের যে পরিতৃপ্তি সাধন করা যায় সেখানে কোন হিসাবের কথা চলে না। যেখানে কালের প্রয়োজন সাধন করি সেখানে হিসাবনিকাশের দায়িত্ব আপনি এসে পড়ে।'' যখন থেকে (কাকতালীয়ভাবে তা বিংশ শতাব্দীর সূচনা বছর ১৯০১) রবীন্দ্রনাথ সামাজিক উপন্যাস লেখা শুরু করলেন, তখনকার কালে তাঁর পরিবেষ্টনীর ভারত-রাজধানী কলকাতার সমাজ নেতৃত্বে পাশ্চাত্য সংস্পর্শ সিঞ্চিত নতুন জীবনাগ্রহে চঞ্চল অভিজাত হিন্দুরা। 'কালান্তর'-এ রবীন্দ্রনাথ এই কাল সম্পর্কে বলছেন, ''য়ুরোপীয় চিত্তের জঙ্গমশক্তি আমাদের স্থবির মনের উপর আঘাত করল যেমন দূর আকাশ থেকে আঘাত করে বৃষ্টিধারা মাটির 'পরে; ভূমিতলের নিশ্চেষ্ট অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করে প্রাণের চেষ্টা সঞ্চার করে দেয়, সেই চেষ্টা বিচিত্ররূপে অঙ্কুরিত বিকশিত হতে থাকে।'' রবীন্দ্রনাথের বলা ও ব্রিটিশ সঙ্গমের ঢাকাচাপা কথাটাই পরবর্তীকালে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের উদোম ব্যাখ্যাতেও সমর্থিত হয় :

"Calcutta's secret charm must, however, escape the impatient, and only an ameture of history will really love it. For nowhere else in the modern world has a new culture emerged from the deliberate intermingling of two older ones ----- the peripheral culture of rural Bengal and the cosmopolitan culture of English whiggery."[১]

বাংলার গ্রাম চৌহদ্দির সমাজের বৈশিষ্ট্যের বীজ শরীরে ধারণ করে, বাঁচায় এবং বেড়ে ওঠায় ইংরেজের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লব্ধ কিছু নীতিবোধ, আদর্শ ও মূল্যচেতনার দ্বৈত সংমিশ্রণে জীবনধারণ করতে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের প্রথম সামাজিক উপন্যাস 'চোখের বালি'র কালেজের সব পরীক্ষায় পাশ করা মহেন্দ্র এবং বিহারীকে। তাদের যৌবনের যে খণ্ডকালকে উপন্যাসের সংকটরূপে তুলে ধরা হল তাতে জীবনদ্বন্দ্বে দুই সমাজই উপস্থিত নিজ নিজ শক্তি প্রদর্শনের বাসনা নিয়ে। উপন্যাসের অন্তিমে কোন স্থায়ী দ্বন্দ্বনিষ্পত্তিমূলক সমাধানও নেই। আপসই সেই কালের অভিজাত হিন্দু বাঙালির টিকে থাকার সত্যাশ্রয়। শাসক ইংরেজের সঙ্গে আপস বৃত্তি ও আয়ের নিশ্চয়তা সুরক্ষিত করতে, গার্হস্থ্যধর্মে পশ্চাদমুখী জীবনবোধে মনপ্রাণ সমর্পিত পূর্বপ্রজন্মের সঙ্গে আপোস নবশিক্ষিত যুবাপুরুষের; যা দেয় গার্হস্থ্য পরিমণ্ডলের ছায়াশ্রয়ে আততি মুক্ত নির্ভার জীবনযাপন, আপোস লম্পট, পরদারগামী স্বামীর সঙ্গে সেকেলে বোধ-বুদ্ধিওয়ালি ধর্মপত্নীর; অস্তিত্বরক্ষাকে বংশরক্ষায় ধারকবর্ম করে তুলতে। 'চোখের বালি' ছেনে যে সামাজিক দ্বন্দ্বগুলো পাওয়া যায় তা এইরকম :

১। ছেলের বিয়েকে কেন্দ্র করে বিধবা মায়ের ভাবাবেগের স্বেচ্ছাচার, যা পারিবারিক সম্পর্কসূত্রের বিন্যাসে বিপর্যয় সৃষ্টি করে।

২। সমাজনীতি ও সমাজশক্তির বিরুদ্ধে যুবতী বিধবা নারীর বিদ্রোহ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম।

৩। বিধবা সুন্দরী শিক্ষিতা নারীর প্রেমের মধ্যে জীবনের চরিতার্থতা অন্বেষণ।

৪। নারীর প্রতি বিবাহিত পুরুষের 'রূপজ মোহ' বা 'দেহ-ভোগ লুব্ধতা'য় নতুন মাত্রা সমতুল নারীর প্রতি বাসনা।

উপন্যাসে চরিত্রদের বাচন, লেখকের ব্যাখ্যা ইত্যাদি থেকে পূর্ববর্ণিত চারটি সমাজদ্বান্দ্বিক সূত্র সমর্থিত হয়। প্রথম সূত্রটির সমর্থনে নিম্নের তিনটি উদ্ধৃতি অভিনিবেশযোগ্য :

ক। "উহার কোমল হাতে আমি হলুদের দাগ লাগাইয়াছি, এখন তুমি (অন্নপূর্ণা) উহাকে ধুইয়া বিবি সাজাইয়া মহিনের হাতে দাও — উনি পায়ের উপর পা দিয়া লেখাপড়া শিখুন, দাসীবৃত্তি আমি করিব।"

খ। "অভিমানিনী রাজলক্ষ্মী মনে মনে কহিলেন, মহেন্দ্র যদি এখন তার বউকে লইয়া আমার ঘরে হত্যা দিয়ে পড়ে, তবু আমি তাকাইব না, দেখি সে তার মাকে বাদ দিয়ে স্ত্রীকে লইযা কেমন করিয়া কাটায়।"

গ। "ওরে বাস্‌রে! উনিই কর্তা, শাশুড়ি কেহ নয়। কাল বিয়ে করিয়া আজই এত দরদ। কর্তারা তো আমাদেরও একদিন বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু এমন স্ত্রৈণতা, এমন বেহায়াপনা তো তখন ছিল না।"

তিনটি উদ্ধৃতি থেকেই মহেন্দ্রর বিয়ে হওয়ার ঘটনায় তার মা রাজলক্ষ্মীর মনোবিকার প্রকটিত হয়, এ বিকার সাংসারিক ক্ষেত্রে কূট-জটিলতা তৈরি করায় তাকে প্ররোচিত করে।

দ্বিতীয় সূত্রেব সমর্থক উদ্ধৃতিগুলো সামাজিক টানাপোড়েনে সমাজে নতুন একটা মনুষ্যবর্গের আবির্ভাব চিনিয়ে দেয়, এরা *যুবতী বিধবা*। মাথার চুল মুড়িয়ে, সাদা থান পরিয়ে, আমিষ বর্জিত আতপ চালের জাবনা খাইয়ে *এদের জৈবিক রসোত্তেজনার ক্ষরণ* প্রতিরোধ করা যাচ্ছিল না আর :

ক। "আমার নিজের সুখ দুঃখ কিছুই নাই? তোমার আশাব ভালো হউক, মহেন্দ্রের সংসারের ভালো হউক, এই বলিয়া ইহকালে আমার সকল দাবি মুছিয়া ফেলিব, এত ভালো আমি নই — ধর্মশাস্ত্রের পুঁথি এত করিয়া আমি পড়ি নাই। আমি যাহা ছাড়িব তাহার বদলে আমি কী পাইব?"

খ। "ভালোবাসার তৃষ্ণায় আমার হৃদয় হইতে বক্ষ পর্যন্ত শুকাইয়া উঠিয়াছে—সে তৃষ্ণা পূরণ করিবার সম্বল তোমার হাতে নাই। সে আমি বেশ ভালো করিয়াই দেখিয়াছি। আমি তোমাকে বারংবার বলিতেছি, তুমি আমাকে ত্যাগ করো, আমার পশ্চাতে ফিরিয়ো না; নির্লজ্জ হইযা আমাকে লজ্জা দিয়ো না।"

বিনোদিনীর এই জীবনক্ষুধাকে রবীন্দ্রনাথ 'সাধু কথার ভিজে গামছা জড়িয়ে' ঢেকে রাখার চেষ্টা করেননি। নতুন কালে এমন বিনোদিনীর সংখ্যা যেভাবে বেড়ে উঠছিল, তাতে এইসব আকাঙ্ক্ষার পথরোধ করা সম্ভবও ছিল না। আমরা সমাজদ্বন্দ্বের মধ্যে তৃতীয় সূত্রে বিধবা নারীর *প্রেমের মধ্যে জীবনে চরিতার্থতা সন্ধানের* যে কথা বলেছি তা নিঃসন্দেহে পুরুষতান্ত্রিক হিন্দু সামন্ত সমাজপ্রতিভূদের ইচ্ছার অনুকূল নয়। কিন্তু বিনোদিনীর প্রেম-এ বাঁচার আকাঙ্ক্ষা সমাজপ্রতিভূদেব প্রতিকূলতাকে অগ্রাহ্য করেই। এমনকি যুবা-পুরুষের প্রেম সম্পর্কিত বোধ-বিবেচনাব ক্ষীণতা এবং খর্বতাতেও তার ভ্রূকুটি উচ্চারিত হয়েছে উপন্যাসে : "আশার মধ্যে তোমরা কী দেখিতে পাইযাছ, আমি কিছুই বুঝিতে পারি না। ভালোই বল মন্দই বল তাহার আছে কি। বিধাতা কী পুরুষের দৃষ্টির সঙ্গে অন্তর্দৃষ্টি কিছুই দেন নাই। তোমরা কী দেখিয়া, কতটুকু দেখিয়া ভোল। নির্বোধ অন্ধ!"

*বিবাহিত পুরুষের দেহভোগ-লুব্ধতায় নতুন মাত্রা আত্মতুলনীয় ঔৎকর্ষ সন্ধান*। অর্থাৎ সুদেহের সঙ্গে শিক্ষা-বুদ্ধি-রসবোধ ইত্যাদির শ্রী সন্ধানী হচ্ছিল পুরুষের পতঙ্গ-মন। নানাভাবে রূপজ মোহ চরিতার্থতার মোড়ক হিসারে মনগড়া চাহিদা লক্ষ্য করা গেল এবং ন্যায়ধর্মের তোয়াক্কা

না করে আপন স্বার্থ অনুকূল ব্যাখ্যা তৈরি করতেও দেখা গেল মহেন্দ্রর মতো তনুশ্রী-রমণার্তি আচ্ছন্ন পুরুষকে : ''বিনোদিনী তাহার অভিভাবকতায় আছে, বিনোদিনীর ভালমন্দের জন্য সে দায়ী। অতএব এরূপ সন্দেহজনক পত্র (বিহারী বাড়ি না থাকায় যা বিনোদিনীর কাছে ফিরে আসে) খুলিয়া দেখাই তাহার কর্তব্য। বিনোদিনীকে বিপথে যাইতে দেওয়া কোনও মতেই হইতে পারে না।'' এই বিধবা যুবতীকে পথ দেখানোর আগ্রহ এতটাই তীব্র হয়ে ওঠে যে আশার অনুপস্থিতিতে নির্জন রাত্রে মহেন্দ্র বিনোদিনীর হাত চেপে ধরে বলে ''বন্ধন যখন স্বীকার করিয়াছ, তখন যাইবে কোথায়।'' — তার পরেই দুহাতে পা বেষ্টন করে নিজের অদম্য প্রবৃত্তির প্রকাশ ঘটায়।

'গোরা' উপন্যাসটা লেখা হচ্ছে ১৯০৭-এ হিন্দু বাঙালির স্বদেশি জাগরণের উগ্রতার আগুনে-সময়ে, অথচ তার পট ১৮৭৯-৮২-র। দুটো কালেই লেখক নিজে কলকাতার অভিজাত বাঙালি সমাজের মধ্যে থেকেছেন, তার আলোড়নে মেতেছেন, হেঁটেছেন; কিন্তু ভেসে যাননি। কোথাও একটা অতীত বিশ্বাসের প্রতি গ্লানির অঙ্কুশ বিদ্ধ করেছে এই উপন্যাস লেখার কালের রবীন্দ্রনাথকে। বিশেষ করে ১৮৯৮-১৯০৬'-এর রবীন্দ্রনাথ তো বেশ সাম্প্রদায়িক, এ কথা সুশোভন সরকার সুন্দরভাবে সপ্রমাণ ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন[২]। যে ভুল জীবনার্থ ও মতাদর্শে নিজের জীবনের কিছুকাল অপচিত হয়েছে, তারই বিগ্রহ করে গড়ে তুলেছেন গোরা চরিত্রকে। যে বলে, ''এখন আমাদের একমাত্র কাজ এই যে, যা কিছু স্বদেশের তারই প্রতি সংকোচহীন সংশয়হীন সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা প্রকাশ করে দেশের অবিশ্বাসীদের মনে সেই শ্রদ্ধার সংঞ্চার করে দেওয়া।'' (পরি-৪)

ভাবকেন্দ্রে ১৯০৭-এর রবীন্দ্র-রাজনীতি দর্শন, অথচ পোশাকি চেহারায় গোরা তিন দশক পেছনের ব্রাহ্ম-হিন্দু সমাজদ্বন্দ্বের কালকে ধারণ করে আছে। সেই কলকাতায় বহু উচ্চঘরের শিক্ষিত হিন্দু যুবকের যেমন গোরার মতো হিন্দুয়ানির গোঁড়ামির মধ্যে আত্মচরিতার্থতা, আবার তেমনই 'ব্রহ্মসভায়' কেশববাবুর বক্তৃতা শুনতে যাওয়াও একাংশের যুবা ও মধ্যবয়সীর জীবনধর্ম। ১৯১০-এর ৮ জানুয়ারি রবীন্দ্রনাথ 'স্কটিশচার্চ কলেজ'-এর সভায় কেশবচন্দ্র সেনের জন্মোৎসবে বলেন, ''যখন আমি বালক, কিছু কিছু জ্ঞান হইয়াছে, তখন ব্রাহ্ম সমাজের বিরোধের সময়। আমার মনেও সেই বিরোধের ভাব, আমার মনে হইতো, তিনি (কেশবচন্দ্র) যে ধর্ম, সে সত্য প্রচার করিতেছেন, তাহা আমাদের স্বদেশীয় নহে, বিদেশীয়। তাহাকে লইয়া যখন খুব গোলমাল হইতেছে, তখন তার প্রতি আমাব একটা বিরোধভাব আসিয়াছিল, এটা আমার বেশ মনে আছে। তখন বোল ছিল স্বদেশি। এই তখন দম্ভ, দর্প ছিল। আমার মনে হইতো বুঝি আমাদের স্বদেশের যে মাহাত্ম্য আছে, বুঝি সে মহাপুরুষ সেই গৌবর খর্ব করিয়াছে।'' ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের এই মনোভাব পোষণ করার কালের কলকাতার অভিজাত বাঙালি সমাজের দ্বন্দ্বধারক উপন্যাস 'গোরা'। এতে আছে ব্রাহ্মদের সঙ্গে হিন্দু অভিজাত ব্রাহ্মণদের ব্রাহ্মণ্যবাদী অনুদারতা, সঙ্কীর্ণতা, পারস্পরিক ঘৃণা, দলবাজি, বিবেকহীনতা, হিংসা-ক্রোধ-পরনিন্দা ও অহঙ্কারের বাস্তবকল্প স্পন্দিত জীবনচিত্র।

লেখনকালের স্বদেশি সন্ত্রাসবাদীদের থেকেও উগ্র গোরার হিন্দুত্বের গোঁড়ামি। তার মুখে শোনা যায়, "অবিনাশ যে ব্রাহ্মদের নিন্দে করছিল তাতে এই বোঝা যায় যে, লোকটা বেশ সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় আছে ...।

... একদল লোক সমাজের বাঁধন ছিঁড়ে সব বিষয়ে উলটোরকম করে চলবে আর সমাজের লোক অবিচলিতভাবে তাদের সুবিচার করবে, এ স্বভাবের নিয়ম নয়। সমাজের লোক তাদের ভুল বুঝবেই, তারা সোজাভাবে যেটা করবে, এদের চোখে সেটা বাঁকাভাবে পড়বেই, তাদের ভালো এদের কাছে মন্দ হয়ে দাঁড়াবেই, এইটেই হওয়া উচিত। ইচ্ছামতো সমাজ ভেঙে বেরিয়ে যাওয়ার যতগুলো শক্তি আছে এও তার মধ্যে একটা।... ব্রাহ্ম হয়ে বাহাদুরি করবার শখ যাদের আছে অব্রাহ্মরা তাদের সব কাজেই ভুল বুঝে নিন্দে করবে, এটুকু দুঃখ তাদের সহ্য করতেই হবে। তারাও বুক ফুলিয়ে বেড়াবে আর তাদের বিরুদ্ধ পক্ষও তাদের পিছন পিছন বাহবা দিয়ে চলবে, জগতে এটা ঘটে না, ঘটলেও জগতের সুবিধে হত না।" (পরিচ্ছেদ-২)

হিন্দু গোরা যা ব্রাহ্ম 'বাহাদুরি' বলে চিহ্নিত করে, তা কেশবচন্দ্র সেন এবং পরবর্তীকালে শিবনাথ শাস্ত্রীদের সমাজ সংস্কার প্রয়াস। সেই প্রয়াসের গভীরতা ও বেগ সম্পর্কে সন্দেহ থাকতে পারে, কিন্তু তার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা কি মূঢ়তা নয়? ১৮৬৩ সালে 'Social Reformation' নামক বক্তৃতায় কেশবচন্দ্র বলেন, "The through Reformation of native society is the object of the Brahmo Samaj. It proposes to give it recognistion upon the basis of pure faith... let members of different castes ... and ignore the distinctions of caste in all that they do... The constructive policy is bring all men within the bosom of one church under the feet of True God, the universal father of all... destroy caste and construct brotherhood." ১৮৭১ সালের ৩০ মার্চ টাউন হলের বিবাহ সংস্কার আইন সংক্রান্ত জনসভার সভাপতির ভাষণে কেশবচন্দ্র বলেন, "The Brahmo Marriage Bill contemplates a more radical and more comprehensive reformation of educated natives to imagine or conceive. It contemplates inter marriages between the Sikhs and Bengalees, the inhabitants of Bombay and Madras, between the Tamil and Telegu races in Southern India and the people of North Western provinces. The bill contemplates a union and fusion of many discordant social elements which lie scattered in the amplitude of the Indian continent and which when gathered together and blended into one harmonious unity, will be called by no other name in future than the Reformed Indian Brotherhood."

উপন্যাসের শেষে (পরিচ্ছেদ-৭৬) মন থেকে মূঢ়তার মূল উৎপাটন করে গোরা কেশবচন্দ্রের এই ভাবাদর্শই উচ্চারণ করে:

ক। "আমি যা দিনরাত্রি হতে চাচ্ছিলুম অথচ হতে পারছিলুম না, আজ আমি তাই হয়েছি। আমি আজ ভারতবর্ষীয়।আমার মধ্যে হিন্দু মুসলমান খৃস্টান কোনো সমাজের কোনো বিরোধ নেই। আজ এই ভারতবর্ষের সকলের জাতই আমার জাত, সকলের অন্নই আমার অন্ন।"

খ। "আজ আমি এমন শুচি হয়ে উঠেছি যে চণ্ডালের ঘরেও আমার আর অপবিত্রতার ভয় রইল না।পরেশবাবু, আজ প্রাতঃকালে সম্পূর্ণ অনাবৃত চিত্তখানি নিয়ে একেবারে আমি ভারতবর্ষের কোলের উপরে ভূমিষ্ঠ হয়েছি — মাতৃক্রোড় যে কাকে বলে, এতদিন পরে তা আমি পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছি।"

গ। "আপনি আমাকে আজ সেই দেবতারই মন্ত্র দিন যিনি হিন্দু মুসলমান খৃস্টান ব্রাহ্ম সকলেরই, যাঁর মন্দিরের দ্বার কোনো জাতির কাছে কোনো ব্যক্তির কাছে কোনোদিন অবরুদ্ধ হয় না, যিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা নন — যিনি ভারতবর্ষের দেবতা।"

'ঘরে বাইরে'তে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমাজনীতির উপলব্ধিগুলো প্রকাশ করেছেন ১৯১৫ সালে দাঁড়িয়ে, অথচ প্রেক্ষাকেন্দ্র ১৯০৭ ও সমসাময়িক বাংলা।এখানে তখন চলছিল স্বদেশি-সন্ত্রাসের রক্তহোলি। এর সূচনা ওই বছরই ২৫মে ঠনঠনিয়া কালীবাড়ির (কলেজ স্ট্রিট মোড় থেকে ২০০ মিটার উত্তরে) কাছে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় বিপিনচন্দ্র পালের দ্বারা হিন্দু দেবী কালীর কাছে উৎসর্গের জন্য একশো একটা জ্যান্ত সাদা পাঁঠা (অর্থাৎ ইংরেজ) বলিদানের আর্জি জানানো।এর পর থেকেই অশান্ত হয়ে উঠতে থাকে কলকাতা, ক্রমে তা সংক্রমিত হয় বাংলার গ্রাম-মফস্বলে।গুপ্ত সমিতি গঠন করে বাংলার জেলায় জেলায় বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী কার্যকলাপ ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে মূল পাণ্ডা হয়ে ওঠেন অরবিন্দ ঘোষ ও তাঁর ভাই বারীন্দ্র ঘোষ। গুরুভজা হিন্দু আধ্যাত্মিকতার পারিবারিক পরম্পরা থাকায় এঁরা অতি সহজেই বয়কট-স্বদেশি-সন্ত্রাসবাদকে হিন্দু মোড়কে আবৃত করতে সমর্থ হন।এই ১৯০৭ সালেই কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশনে দলত্যাগ করেন মডারেট বিরোধীরা।তাঁদের প্রভাবেই বাংলায় ১৯টা গুপ্ত সমিতি তৈরি হয়, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রধান দল ছিল, 'ঢাকা অনুশীলন সমিতি' ও 'স্বদেশ বান্ধব' সমিতি। এ দুই দলের প্রতিষ্ঠাতা যথাক্রমে পুলিন দাস ও অশ্বিনীকুমার দত্ত।এই দলগুলো জনসেবা, ত্রাণকাজ, গঠনমূলক কাজের সঙ্গে সন্ত্রাসপন্থাকে একাকার করে দিয়েছিল। 'ঘরে বাইরে'তে সেই সন্ত্রাস-স্বদেশি-হিন্দুত্বের আবহ ফুটে উঠেছে, তার সঙ্গে অন্তর্বিজড়িত রবীন্দ্রনাথের সন্ত্রাসবিরোধী আত্মদর্শনও :

ক। "হঠাৎ পাগড়ি-বাঁধা গেরুয়া-পরা যুবক ও বালকের দল খালি পায়ে আমাদের প্রকাণ্ড আঙিনার মধ্যে, মরা নদীতে প্রথম বর্ষার গেরুয়া বন্যার ধারার মতো, হুড়হুড় করে ঢুকে পড়ল।"

খ। 'সেই ভিড়ের মধ্যে দিয়ে বড়ো চৌকির উপর বসিয়ে দশ-বারোজন ছেলে সন্দীপবাবুকে কাঁধে করে নিয়ে এল। বন্দে মাতরম! বন্দে মাতরম!"

গ। "সন্দীপবাবু যখন এখানে এসে বসলেন তার চেলারা চার দিক থেকে আনাগোনা করতে লাগল, মাঝে মাঝে হাটে বাজারে বক্তৃতাও হতে লাগল—তখন এখানেও ঢেউ উঠতে লাগল।

একদল স্থানীয় যুবক সন্দীপের সঙ্গে জুটে গেল। তাদের মধ্যে অনেকে ছিল যারা গ্রামের কলঙ্ক। উৎসাহের দীপ্তির দ্বারা তারাও ভিতরে বাহিরে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।" এই উৎসাহই অনতিবিলম্বে জবরদস্তি আর মুসলমান-বিদ্বেষে রূপ নিল : "আমাকে সন্দীপ এসে বললেন, এত বড়ো হাট-বাজার আমাদের হাতে আছে, এটাকে আগাগোড়া স্বদেশি করে তুলতে হবে। এই এলাকা থেকে বিলিতি অলক্ষ্মীকে কুলোর হাওয়া দিয়ে বিদায় করা চাই। আমি কোমর বেঁধে বললুম, চাই বৈকি। সন্দীপ বললেন, এ নিয়ে নিখিলের সঙ্গে আমার অনেক কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে, কিছুতে পেরে উঠলুম না। ও বলে বক্তৃতা পর্যন্ত চলবে, কিন্তু জবরদস্তি চলবে না।" আর মুসলমান-বিদ্বেষের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ সন্দীপপন্থী স্বদেশিদের যে বাচন নির্মিত করেছেন তা মধ্যযুগীয় বর্বরতার নামান্তর : "ভাই-বেরাদার বলে অনেক গলা ভেঙে শেষকালে একটা বুঝেছি, গায়ে হাত বুলিয়ে কিছুতেই মুসলমানগুলোকে আমাদের দলে আনতে পারব না। ওদের একেবারে নিচে দাবিয়ে দিতে হবে, ওদের জানা চাই, জোর আমাদেরই হাতে। আজ ওরা আমাদের ডাক মানে না, দাঁত বের করে, 'হুঁউ' করে ওঠে; একদিন ওদের ভালুক নাচ নাচাব।"

এই সন্ত্রাস দমন করতে ইংরেজ সরকার কঠোরতম পদক্ষেপ নিতে শুরু করে। 'যুগান্তর' পত্রিকা দপ্তর তল্লাশি (৭।৮।১৯০৭), অন্যতম সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে গ্রেপ্তার (২৪।৭। ১৯০৭), 'বন্দোমাতরম' সম্পাদক অরবিন্দ ঘোষ গ্রেপ্তার (১৭।৮।১৯০৭), বিপিনচন্দ্র পালের ছয় মাসের কারাদণ্ডাদেশ (১০।৯।১৯০৭), বিডন স্ট্রিট ও চিৎপুর রোডে পর পর দুদিন পুলিশ-জনতা খণ্ডযুদ্ধ (২ ও ৩ অক্টোবর ১৯০৭) ইত্যাদি ঘটনা তার প্রমাণ। এই পর্বে বছরের শেষে শুরু হল নতুন পর্যায়, স্বদেশি ডাকাতি। বজবজ লাইনে চিংড়িপোতা স্টেশনের স্টেশন মাস্টারের অফিসে ডাকাতি হয় ৭ ডিসেম্বর ১৯০৭। পরের বছরগুলোতে তা উত্তরোত্তর বাড়তে এবং ছড়াতে থাকে বাংলাব বিভিন্ন প্রান্তে। 'ঘরে বাইতে' তে অমূল্যর কাছারি লুঠ যার বাস্তবকল্প আখ্যান রূপায়ণ। মনে রাখতে হবে, যে বছর 'ঘরে বাইরে' লেখা শুরু হচ্ছে সেই ১৯১৫ তে বাংলায় স্বদেশি ডাকাতি সংখ্যায় ১৯০৭ থেকে পরবর্তী বছরগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ; ২৫টি। রবীন্দ্রনাথ এই অবিমৃশ্যকারিতার বিরোধী অবস্থানে দাঁড়িয়ে বিরূপ সমালোচনার অঙ্কুশবিদ্ধ হয়েই 'ঘরে বাইরে'র আখ্যানে সমকালের সমাজদ্বন্দ্বকে কথারূপ দিয়েছেন।

১৮৯৮ সালের প্লেগধ্বস্ত কলকাতা 'চতুরঙ্গ' (১৯১৬) উপন্যাসের প্রেক্ষাপট। এই সমাজের কলকাতাবাসী হিন্দু বাঙালি ছিল মারাত্মক রকমের রক্ষণশীল ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন। ধর্মান্ধতায় এরা অক্লেশ শরণাগতি নেয় জাগতিক অপ্রাপ্তির অনুপূরক হিসাবে। সেখানে বিমূর্ত ভূমানন্দের অলীক আস্বাদ তখনকার ধর্মসভা, বই পুস্তকে যথেষ্ট পাওয়া যায়। প্লেগের চিকিৎসাকে কেন্দ্র করে বক্ষণশীল সংস্কার ও অলীক শালীনতার-বিনষ্টি-ভীতি তখনকার কলকাতার বাঙালি হিন্দুর স্বরূপ চিনিয়ে দেয়: "... ডাক্তাররা (বিশেষ করে সাহেব ডাক্তাররা) এসে রোগ নির্ণয়ের জন্য মেয়েদের উরু ও কটির সন্ধিস্থল পরীক্ষা করবে জেনে জনগণ আরো আতঙ্কিত হল। যুগপৎ আতঙ্কে লোক শহর ত্যাগ করতে লাগল।"[৩]

এই কালের অভিজাত বাঙালি হিন্দুদের জীবনবৃত্ত ছিল একইরকম : তত্ত্ব নির্ণয়ে উন্মত্ততা > প্রাণের ব্যাকুলতা > অতৃপ্তি এবং শেষে কোন এক গুরুপদে শরণাগতি। 'চতুরঙ্গ'-র শচীশের জীবনেও তেমনটাই দেখা যায়। তখনকার সংশয়াপন্ন বাঙালি শিক্ষিত হিন্দু-যৌবনের সাধারণ ধর্ম ছিল দায়িত্বগ্রহণে ভীতি। একেই স্বামী বিবেকানন্দ শোধন করে নির্বীজনের নবজীবনপন্থার খাত তৈরি কবেন। এ জীবনপথে জীবনের ধারক শরীরকে অগ্রাহ্য করার সমান্তরালে শরীর ও অর্থের বাসনায় নিমজ্জিত গৃহীদের সেবা করার নবব্রত চমৎকৃত করল অভিজাত অনভিজাত নির্বিশেষে বাঙালি এবং এমনকী ভাবতের অন্যান্য প্রদেশবাসী হিন্দুদের। আত্মউপেক্ষার এই কঠোব ব্রতপথে নিবেদিতা নারীর সঙ্গও কেবল মানসিকভাবে গ্রহণযোগ্য। উপন্যাসে দামিনীও শচীশকে পেতে মাথা ঠোকে, মুখ-বুক দিয়ে আঁকড়ে ধরে — কিন্তু ভীরু শচীশ 'পায়ে ঠেলে শিহরিত' হয় বা 'ছুটিয়া ফিরিয়া' বেড়ায়। শচীশ স্বামী বিবেকানন্দের আত্মত্যাগ-পথ নেয়নি। জগদীশ চন্দ্র বসুর বিজ্ঞানপন্থাও তার অন্বিষ্ট নয়। 'পাত্রাধার কি তৈল', না 'তৈলাধার কি পাত্র' — এই কূট সমস্যায় মেতে থাকা গরিষ্ঠ হিন্দু এলিটের আত্মীয় সে। দোলাচলতাই সেদিনের বাঙালি হিন্দুর জীবনসত্য। তৎকালের আরও দুজন মহামানব বাঙালির বাস্তবজীবনের দোলাচল ও অস্থিরতার ধরনটা শচীশ চরিত্রের ভ্রূণটাকে চিনিয়ে দেয়। এঁরা হলেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও কেশবচন্দ্র সেন। এঁরা উভয়েই নিরাকার, ব্রহ্মবাদী হয়েও পরে পৌত্তলিক হিন্দুধর্মে প্রত্যাবর্তন করেন। শচীশের জ্যাঠামশাইয়ের প্রভাবে নাস্তিকতা, জ্যাঠামশাইয়ের মৃত্যুর পর 'চাটগাঁয়ের কাছে' লীলানন্দ স্বামীর আখড়াধারী হয়ে বৈষ্ণব হওয়ার প্রয়াস, দামিনীব সান্নিধ্যে থাকতে চৈতন্যের হৃৎপদ্মে নিয়ত প্রকৃতির প্রলোভনে বিচলিত হতে থাকা — শেষ পর্যন্ত কোন কিছুতেই থিতু হতে পারেনি শচীশের মন। এই অনিকেত জীবনধারণ উপন্যাসের বর্ণিত কালের সমাজ সত্যের স্মারক। উপন্যাসের ভিতর থেকে রবীন্দ্রনাথ ব্যবহৃত 'রূপ', 'রূপক', 'রস' প্রভৃতি শব্দধারণার নিপুন কুশলী প্রয়োগ মধ্যবর্তিতায় ঘুঘুধ্বনিময় এম্পিরিসিজম-এর প্রবক্তাবা যতই চতুবঙ্গ-র সামাজিক প্রেক্ষিতকে খর্ব করে ব্যাখ্যা করুন, তাদের এই সর্বজ্ঞানী ব্যাখ্যা নিরবধি কালের চোখে ধবা পড়বেই। 'অপূর্ব আরক'কল্প ব্যাখ্যার ধূম্র-আচ্ছন্নতা ভেদ করে চতুবঙ্গকে সামাজিক উপন্যাস হিসাবে পড়া এবং ব্যাখ্যায ও চর্চায় এর অন্তর্লীন সমাজদ্বন্দ্বের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন আমাদের মহতী দায়। এর জন্য চতুবঙ্গকে আরও বেশি করে বুঝতে হবে কেশবচন্দ্র সেন, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বিজয়কৃষ্ণেব দাপিয়ে বেড়ানো উনিশ শতাব্দীর শেষ চল্লিশ বছরের কলকাতার সামাজিক ইতিহাসের অনুষঙ্গে। সেই ইতিহাসে ভারতীয় জনজীবনের তৎকালীন আর্থ-সামাজিক অধোগতির নিবিষ্ট অধ্যয়নও অতি আবশ্যক। এবং সর্বোপরি আখ্যানের প্রেক্ষিতকালের চেতনা, 'যে বছর কলিকাতা শহরে প্লেগ দেখা দিল' সেই বছরের কলকাতা এবং বঙ্গ ও বাঙালি জীবনের সামাজিক এবং ভাবজীবনের চালচিত্রের উজ্জ্বলতা ইতিহাস খুঁড়ে যত স্পষ্ট করা যাবে, ততই চতুরঙ্গ-র জলঝর্ণাব ছবি শতগুণ উজ্জ্বলতা নিয়ে আমাদের কাছে স্পষ্ট হবে। ঘুঘুধ্বনিতে সিদ্ধ ব্যাখ্যাকাবদের অলীক মোড়ক ছাড়ানো 'চতুরঙ্গ' বাঙালির সমাজ ইতিহাসের অনেক অনালোকিত দিগন্তকে খুলে দেবে।

'যোগাযোগ' উপন্যাসটার পাপড়ির ভিতরে আছে বেশ প্রাপ্তবয়স্ক মনস্কতার দাবি। বিশেষত কুমুর সঙ্গে মধুসূদনের সামাজিক বন্ধনের পরবর্তী হাইফেন হিসাবে যে জৈব যোগের টানাপোড়েন এবং দ্বিধা আছে তার গভীর ব্যবায়বিদ্যাগত অর্থবোধ ব্যতিবেকে এই উপন্যাসের পাঠ-অবধান অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কেননা একটু বেশি বযসে বিযে করা মধুসূদনেব চোখেব দেখায় ও কানের শোনায় অঙ্গসঙ্গেব পূর্ব অভিজ্ঞতাও ছিল, কুমুর অবযবের মদলেখা সে অবগাহনও করতে চায়, যতই তার 'রূপ ও যৌবনের অভাব' (পবিচ্ছেদ ৩৫) থাক। ''কুমুর মনটা কেবলই তার মুষ্টি থেকে ফসকে যাচ্ছে তাব কারণ মধুসূদনের রূপ ও যৌবনের অভাব, এতে তার সন্দেহ নেই। এইখানেই সে নিরস্ত্র, সে দুর্বল। চাটুজ্যেদের ঘরের মেয়েকে বিযে করতে চেয়েছিল, কিন্তু সে যে এমন মেয়ে পাবে বিধাতা আগে থাকতেই যার কাছে তার হার মানিয়ে রেখে দিয়েছেন, এ সে মনেও কবেনি।'' বৃথাই ধনবাদ ও সামন্তবাদী আভিজাত্যেব ভাবদ্বন্দ্ব হিসাবে 'যোগাযোগ' উপন্যাসকে কাঠামবন্দি করে ব্যাখ্যার চেষ্টা করা হয়। মাঝেমধ্যে 'ডাইরেক্টারদের মিটিং' (পরিচ্ছেদ ৩৭), সেক্রেটারি (পরিচ্ছেদ ৩৮), 'ট্রেজারারের পদ' (পরিচ্ছেদ ৪১), 'কোম্পানীর কেনাবেচা' (পরিচ্ছেদ ৪১) — ইত্যাদি ধনবাদী জীবনের টঙ্কন (Coinage) থাকলেও মধুসূদন হাড়ে-মর্মে সামন্ততান্ত্রিক। তার জীবনযাপন, ভাবনা, মদগর্বিতা সবেতেই বাঙালি সামন্তপ্রভুর উদ্বতচারিতা। ধনার্জন সে পুরুষকার দিয়েই করেছে, তবু অতীত-জীবনের দারিদ্র্যের গ্লানি তাকে অনুদার করে রেখেছে। আর আছে হীনম্মন্যতা · ''বিপ্রদাসের কাছে মধুসুদন মনে মনে কি রকম খাটো হয়ে থাকে সেইটিতে তার রাগ ধরে।''

একদা তার পূর্বপুরুষরা যে জমিদার ব্যবসায়ীদেব কর্মচারী ছিল, পরে ধনোপার্জন করে টেক্কা দিতে গিয়ে নিগৃহীত হয়ে গ্রামত্যাগ করেছিল, সেই চ্যাটার্জী জমিদারেব পড়তি দশায় তাদেব সম্পত্তি বন্ধক রাখার পর বাড়ীর মেযেকেও বিয়ে করে পূর্বপুরুষের হয়ে একাই যেন সমস্ত প্রতিশোধের মূল ও সুদ উসুল কবতে চায় মধুসূদন। তাই পড়তি জমিদার বিপ্রদাস হয়ে যায় তার নিশানা :

ক। ''তুমি তোমার দাদার চেলা, কিন্তু জেনে রেখো, আমি তোমার সেই দাদার মহাজন, তাকে এক হাটে কিনে আব এক হাটে বেচতে পারি।''

খ। 'তোমার দাদার সঙ্গে পরামর্শ করে স্বামীর ঘর করতে চাও। ... তোমার দাদা তোমার গুরু! ... তাঁর হুকুম না হলে আজ কাপড ছাড়বে না, বিছানায় শুতে আসবে না। তাই নাকি?''

গ। ''এ তোমাদের নুরনগরি চাল, দাদার ইস্কুলে শেখা। ... ওই চাল তোমাব না যদি ছাড়াতে পারি তা হলে আমার নাম মধুসূদন না।''

ঘ। ''. . বিপ্রদাসবাবুর উপরে রাগটা ওঁকে যেন পাগলামির মতো পেয়ে বসেছে, দিনে দিনে বেড়েই চলল।''

আড়তদাব তো বস্তুত মুৎসুদ্দি। মধ্যস্থতার এই আয়ের সঙ্গে আছে মহাজনি কারবার। নব্যধনীর রুচিহীন বহ্বাডম্বরের বিসদৃশ সমাবেশ তার বাসস্থান। গৃহশাসনে প্রায দাসমালিকের প্রভুত্ব

ক। "আত্মীয় বলে ও কাউকে মানে না। এ বাড়িতে কর্তা থেকে চাকর-চাকরানি পর্যন্ত সবাই গোলাম।" (পরিচ্ছেদ ২৬)

খ। "এ বাড়িতে তোমার স্বতন্ত্র জিনিস বলে কিছু নেই।" (পরিচ্ছেদ ২৬)

গ। 'আমার ঘরের বউ আমার ইচ্ছেমতো চলবে, আর কারো পরামর্শমতো চলবে না — এইটে হল নিয়ম।" (পরিচ্ছেদ ৩১)

ঘ। "কোনটা নিজের কোনটা নিজের নয়, সে বিচার্ এ বাড়ির কর্তা করে দেন।" (পরিচ্ছেদ ৩০)

নব্য ধনী মধুসূদন তার পূর্বপুরুষদের পরাভবের গ্লানি মুছতে চেয়ে চাটুজ্যেদের উনিশ বছরের সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করেছে, তার আগে বন্ধক রেখেছে চ্যাটার্জিদের সম্পত্তি। তার নবার্জিত ধনের দীপ্তি বিপ্রদাসের সামন্ত গরিমার কাছে আপাতম্লান মনে হলেও ক্রুর মধুসূদন পড়তি জমিদার বিপ্রদাসের সহজ গৌরবকে ধ্বংস করতে চেয়েছে। হয়তো সে 'শান্তি' পেয়েছে কুমুদিনীর দাদার গৃহে চলে গিয়েও গর্ভলক্ষণের প্রকাশদৃষ্টে ফিরে আসায়। স্ত্রীও তার বংশরক্ষার সন্তান ধারণ করেছে। সেই সন্তানও তো জীবনের একত্রিশ বছর পার কবে বত্রিশে পদার্পণ করেছে। ধনাঢ্য মধুসূদনের দ্বিতীয় প্রজন্ম জন্মদিনে ভোর থেকে পাচ্ছে অভিনন্দনের টেলিগ্রাম আর ফুলের তোড়া। অর্থাৎ মর্যাদা কমেনি তার, বরং হয়তো বেড়েছে। এই কালে অবিনাশ ঘোষালের মায়ের বয়স একান্ন। কোথায় সে, কেমন, — এসব কথা নেই উপন্যাসে। ভাবতে হবে, গড়পড়তা সন্তানপালন থেকে গিন্নিপনার সোজা পথেই তার জীবন বয়ে গেছে। বিপ্রদাস সশরীরে হয়তো 'লুপ্ত', কুমুদিনীর একান্ন বছরের জীবন মধুসূদনের সেবায় আত্মসমর্পণ করেছে। এই চরিতার্থতাই তো উনিশ-বিশ শতাব্দীর কলকাতার বাঙালি নব্যধনীর কাম্য। সেখানে সামন্ত সংস্কারের ভেতরেই লালিত কুমুর শুচিতা, মন তৈরি করে দেহ সমর্পণের সময় বিবাম প্রভৃতি বিসর্জন দিয়ে, 'পুণ্যসম্মিলনের নিত্যক্ষেত্র' (পরিচ্ছেদ – ৩০)-র ধারক্ হয়ে জৈবসুখের অসাড় নিত্যলীলায় অংশ নেওয়ার মধ্য দিয়ে ভেসে যায় সামন্ততন্ত্রী মাটির বাহারি ব্যতিক্রমী বিশেষত্ব। উনিশ-বিশ শতাব্দীর কলকাতার বাঙালি হিন্দুর জীবনধারা মধুসূদন-বিপ্রদাসদের যেমন ঘৃণাজলধির দুপাশে দাঁড় করিয়েছে, তেমনি এদের বিমিশ্রণে তাদের শ্রেণিগত অস্তিত্ব রক্ষা ও তার সম্প্রসারণও ঘটেছে। তাই 'যোগাযোগ' বাস্তবিকই উনিশ-বিশ শতাব্দীর নব্য বিবর্তিত হিন্দুত্বের এক বৃন্তের দুই কুসুম, বাবু আর ভদ্রলোক শ্রেণির যোগ এবং অযোগ-এর আখ্যান।

রবীন্দ্রনাথের তিন দশকে লেখা পাঁচটি সামাজিক উপন্যাসের ভিতরেই আমাদের সন্ধানী দৃষ্টি ঘুরেছে সমাজদ্বন্দ্বের ভিতরের শিকড় ও ডালপালাগুলোকে বের করে আনতে। এই পর্বের 'নৌকাডুবি'র কাঁচা নভেলেটিধর্মিতার জন্য তা আলোচনার বাইরেই থেকে যায়। আর পরবর্তী 'শেষের কবিতা', 'দুই বোন', 'মালঞ্চ' ও 'চারঅধ্যায়ে' সমাজদ্বন্দ্ব খুব বেশি নেই। সেখানে মিলন-বাসনাবিমুগ্ধ নারীপুরুষরা আছে, বৃহৎ সমাজকে অগ্রাহ্য করেই যারা প্রেম-অপ্রেম-ন্যায় ও হিংসার ক্ষুদ্র খেলার অবকাশ করে নিয়েছে। আমরা এমন আখ্যানে সামাজিক বহতা জীবনস্রোতের দ্বান্দ্বিকতার প্রগাঢ় ও

প্রশস্ত উপস্থাপনা দেখি না, তাই এগুলোর আলোচনা বর্জন করেই রবীন্দ্রনাথের পাঁচটি সর্বার্থে সামাজিক পদবাচ্য উপন্যাসই বেছে নিয়েছি। উপন্যাস ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্বসার থেকে গড়ে ওঠে। সেখানে 'প্রামাণ্য মূল্যবোধের জন্য অপ্রামান্য অনুসন্ধানের' কল্পকথার জাল বোনা হয়। 'চোখের বালি' থেকে 'যোগাযোগ' পর্যন্ত প্রধান পাঁচ উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্ব-জীবনযাপন অভিজ্ঞতার নিরিখে কলকাতার বাঙালি হিন্দু এলিটদের দ্বন্দ্বমন্থিত জীবন-স্বরূপকে অত্যন্ত স্পষ্ট অবয়ব দিয়েছেন। তাঁর এই পাঁচটি উপন্যাসের নির্যাস বস্তুতপক্ষে আমাদের কাছে বাঙালি জীবনের উনবিংশ-বিংশ শতাব্দী সন্ধিকালের অন্তঃপাতী অর্দ্ধশতাব্দীর বিশ্বস্ত ইতিহাসের পরিপূবক।

## ।। উল্লেখপঞ্জি ।।


১। 'The World's Cities', 'Encounter' June-১৯৫৭, P-88

২। 'নবজাগরণ' প্রবন্ধের ৮ পরিচ্ছেদ-এ বিস্তৃতভাবে যা বর্ণিত।

৩। 'কলকাতা উনিশ শতক ঘটনাক্রম' শ্রীধব মুখোপাধ্যায়, 'মহাদিগন্ত' পদ্মপুকুব মোড, বারুইপুর, কলকাতা - ৭০০ ১৪৪, পৃ - ১৬৫।


প্রবন্ধটি উমেশচন্দ্র কলেজ-এর 'সার্ধশতবর্ষে রবিস্মরণ' অনুষ্ঠানে ২৪ সেপ্টেম্বব ২০১০ বক্তৃতাকাবে উপস্থাপিত হয এবং প্রথম মুদ্রিত হয় মে'২০১১।

# রবীন্দ্রনাথের পরিণত স্বদেশবোধ ও তাঁর উপন্যাস

।। ১।।

"যখন আমি বালক, কিছু কিছু জ্ঞান হইয়াছে তখন ব্রাহ্ম সমাজে বিরোধের সময়। আমার মনেও সেই বিরোধের ভাব। আমার মনে হইত, তিনি যে ধর্ম, যে সত্য প্রচার করিতেছেন, তাহা আমাদেব স্বদেশীয় নহে, বিদেশী, তাঁহাকে লইয়া যখন খুব গোলমাল হইতেছে, তখন তাঁর প্রতি আমার একটা বিরোধ ভাব আসিয়াছিল, এটা আমার বেশ মনে আছে। তখন বোল ছিল স্বদেশী। এই তখন দম্ভ, দর্প ছিল। আমার মনে হইত বুঝি আমাদের স্বদেশের যে মাহাত্ম্য আছে, বুঝি সেই মহাপুরুষ সে গৌরব খর্ব করিয়াছেন।" রবীন্দ্রনাথ তাঁর বালককালের নবজাগ্রত স্বদেশবোধকে পরিণত বুদ্ধি দিয়ে পূর্ববর্ণিত ভাষায় প্রকাশ করেন ১৯১০ সালের ৮ জানুয়ারি কেশবচন্দ্র সেনের জন্মোৎসবে স্কটিশচার্চ কলেজের সভায় সভাপতির বক্তৃতায়। এই বর্ণিত কালে তাঁর শৈশবে ববীন্দ্রনাথ তাঁদের পরিবাবের পরিমণ্ডলে মহাকল্লোলদৃষ্টে ব্রাহ্মধর্মের থেকে বেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন স্বাদেশিকতার দ্বারা। তাঁদের পরিবারে তখন 'হিন্দুমেলা'র নেতৃত্ব দিচ্ছেন গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। এটা রবীন্দ্রনাথের জীবনে এমন একটা পর্ব যা তাঁকে প্রাচ্য তথ্য সনাতন ভারতীয় সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তুলেছিল। এই শ্রদ্ধা এমনকি অনেকক্ষেত্রে রক্ষাশীলতা, কুসংস্কার এবং গোঁড়ামীর পক্ষেও তাঁকে কথা বলতে বা মত প্রকাশ করতে উদ্বুদ্ধ করে। ১৮৮৩ সালে 'অনাবশ্যক' প্রবন্ধে তিনি লেখেন, "প্রত্যক্ষকে দেখিয়া অপ্রত্যক্ষকে মনে আনাই পৌত্তলিকতা। জগৎকে দেখিয়া জগতাতীতকে মনে আনাই পৌত্তলিকতা। অনেকগুলি অর্থহীন প্রথা পূর্বপুরুষদিগের ইতিহাস বলিয়াই মূল্যবান। তুমি যদি তাহার মূল্য দেখিতে না পাও, তাহা অকাতরে ফেলিয়া দাও, তবে তোমার শরীরে দয়া-ধর্ম কোনখানে থাকে তাহাই আমি ভাবি।... আমার অতীতের মধ্যে আমার কতকগুলি তীর্থস্থান প্রতিষ্ঠিত আছে, যখন বর্তমানে পাপে-তাপে-শোকে কাতর হইয়া পড়ি তখন সেই তীর্থস্থানে গমন করি।" ১৮৮৫ সালে 'সমস্যা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, "বঙ্গসমাজের যে অংশে ইংরেজী সভ্যতার তাত লাগিতেছে সেখানটা দেখিতে দেখিতে লাল হইয়া উঠিতেছে, কিন্তু শ্যামল অংশটির সঙ্গে তাহার কিছুতেই বনিতেছে না।... সাম্প্রদায়িকতার অনুরোধে সামাজিক স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ করা অন্ধ গোঁড়ামির কার্য। ... সকল অবস্থাতেই আইনুপূর্বক বাল্যবিবাহ বন্ধ করিলে সমাজে দুর্নীতি প্রশ্রয় পাইতে পারে।" এই পর্বে তাঁর কাছে ভারতবর্ষ আর হিন্দু পরম্পরা সমার্থক, তাই লেখেন, "ব্রহ্মাই ভারতবর্ষেব জাগ্রত দেবতা, জিহোভা, গড্ অথবা আল্লা আমাদের ভাবের সম্পূর্ণ গম্য নহেন।" এই বিষয়টাকে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচেতনা বিবর্তনের

ধারাবাহিকতার একটা খণ্ডাংশ হিসেবে দেখতে হবে। এটা জাগ্রত কৈশোরের পর নবযৌবনে কেটে গেলেও পরে আবার ফিরে আসে ১৮৯৮ থেকে ১৯০৬ সালের চিন্তাভাবনা ও রচনায়। কিন্তু ১৯০৬ পরবর্তী রবীন্দ্রনাথের আমৃত্যু স্বদেশচেতনাই ভাবীকালের ভারতীয় এবং বাঙালির কাছে অক্ষয় উত্তরাধিকাব। যা আমরা তাঁর অন্যান্য রচনার মতো উপন্যাসের মধ্যেও লক্ষ্য করি। সে অর্থে উপন্যাস রচনায় একজন রচয়িতা তাঁর উপজীব্য কালের জীবনধারার সার্বিক প্রবহমান স্পন্দনকে ধরে রাখার সক্ষমতা দেখানোর ক্ষমতাসিদ্ধির স্বাক্ষর রাখেন। রবীন্দ্র উপন্যাসও আমাদের সেই বোধে স্থিত করে যখন তাঁর 'গোরা', 'চতুরঙ্গ', 'ঘরে বাইরে', 'যোগাযোগ' বা 'চার অধ্যায়'কে পড়ে দেখি।

।। ২ ।।

হিন্দুত্বের সংকীর্ণতা, সেই সংকীর্ণতার প্ররোচনায় ব্রাহ্ম বিদ্বেষ, ব্রাহ্ম বিদ্বেষের সমান্তরালে নারী বিদ্বেষ প্রভৃতি ভ্রান্তিকে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'গোরা' উপন্যাসের নায়ককে যে ভবিষ্যতের ভিত্তিতলে উপনীত করে আখ্যানের সমাপ্তি টেনেছেন সেখানে স্বদেশ-বোধ অর্থে অখণ্ড ভারত-বোধ এবং সার্বিক মানব-কল্যাণই একমাত্র বিবেচ্য। এই স্বদেশভাবনা কোন সংকীর্ণ জাতি-ধর্ম ও সমাজ-বিধানের দ্বারা চালিত যান্ত্রিক নিয়মের অনুরণন সৃষ্টি করে না। তাই একদা সনাতন হিন্দুত্বের আদর্শে গরীয়ান গোরার অকপট স্বীকারোক্তি উচ্চাবিত হয় : "আমি যা দিনরাত্রি হতে চাচ্ছিলুম অথচ হতে পারছিলুম না, আজ আমি তাই হয়েছি। আমি আজ ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দু মুসলমান খৃস্টান কোনো সমাজের কোনো বিরোধ নেই। আজ এই ভারতবর্ষের সকলের জাতই আমার জাত, সকলের অন্নই আমার অন্ন।" এই বোধ বিনয়ের মধ্যে অনেক আগেই সংহত হয়েছিল, তাই তার পক্ষে বলা সম্ভব হয় : "দেশের জন্যে, সমাজের জন্যে, আমাদের কিছু আশা করবার নেই — চিরদিনই আমরা নাবালকের মত কাটাবো এবং ইংরেজ আমাদের অছি নিযুক্ত হয়ে থাকবে — ... ইংরেজের প্রবল শক্তি এবং সমাজের জড়তার বিরুদ্ধে আমাদের কোথাও কোন উপায়মাত্র নেই। আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত লোকেরা এই কারণেই চাকুরীর উন্নতি ছাড়া আর কোন কথা ভাবে না। ধনী লোকেরা গবর্মেন্টের খেতাব পেলেই জীবন সার্থক বোধ করে ... সুদূর উদ্দেশ্যের কল্পনার কথাও আমাদের মাথায় আসে না।"

'ঘরে বাইরে' লেখার কালে ১৯১১ সালে জুড়ে দেওয়া বাংলাপ্রদেশ স্বদেশী সন্ত্রাসবাদের ছায়াচ্ছন্ন। রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী হলেও সন্ত্রাসপন্থায় স্বাধীনতা আন্দোলনের সমর্থক নন। এজন্য সন্ত্রাসবাদের সমর্থকরা রবীন্দ্রনাথকে তীক্ষ্ম ভাষাঅঙ্কুশে বিদ্ধ করেছেন। 'বরিশাল হিতৈষী' পত্রিকায় 'নভেলে রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক সন্দর্ভে লেখা হয়, "রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধি বাকী কোন দিকে? তিনি এখন পূর্ণ সার। অর্থের সম্মানের অবধি নাই। দেশহিত করিতে যাইয়া তাঁহাকে এক পশুপতিনাথ বসুর বাড়ীর সভায় ব্যতীত অন্য কুত্রাপি হতাশ হইতে হয় নাই। বিধির বাঁধন রাখতে গিয়ে তাঁকে জেলে যেতে হয়

নাই। এমনকি বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে দিয়ে একলাও চলতে হয় নাই। বরং নানা কারণে তিনি সারত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। তা সে ঋণ শোধ করিতে গিয়া তিনি ১৩২২ সালে ১৩১২ সনের ঝাল মিটাইলেন কেন? ... তিনি পরস্ত্রী মজাইবার একটা চিত্র আঁকিয়া দিলেন। ঘরে বাইরের উপসংহারে তিনি স্বদেশীর সবকার্যই দোষদুষ্ট বলিয়া বাহবা লইয়াছেন।'' বস্তুতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের তৎকালিক স্বদেশ ভাবনার তাত্ত্বিক কল্পপুরুষ 'ঘরে বাইরে'র নিখিলেশ, সন্দীপ ও চন্দ্রনাথ বাবুরা। বিকল্প স্বদেশচিন্তা রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের ১৯০৭ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত একটা পছন্দের এবং সমাদরের প্রকল্প। এই প্রকল্প ঘোষিতভাবেই বিপরীত অবস্থান নেয় সঙ্কীর্ণ দেশাত্মবোধের। 'জীবনস্মৃতি'তে (১৯১২) রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাল্যকালের 'হিন্দুমেলা' সংশ্লিষ্টতার যে বর্ণনা দিয়েছেন তার খোলসটা যে আরও শ্রেণিগত আর্থসামাজিক পুর দিয়ে ভরে উঠেছিল তা বুঝতে অসুবিধা হয়না 'ঘরে বাইরে'-কে এর কালের সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে, বোঝাও যায় এখানে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশভাবনার বিশিষ্ট প্রবণতাটা। লিখেছিলেন, ''স্বদেশে দিয়াশলাই প্রভৃতির কারখানা স্থাপন করা আমাদের সভার উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি ছিল। এজন্য সভ্যেরা তাঁহাদের আয়ের দশ অংশ এই সভায় দান করিতেন। আমাদের এক বাক্সে যে খরচ পড়িতে লাগিল, তাহাতে একটা পল্লীর সম্বৎসরের চুলোধরানো চলিত। আরো একটু সামান্য অসুবিধা এই হইয়াছিল যে, নিকটে অগ্নিশিখা না থাকিলে তাহাদিগকে জ্বালাইয়া তোলা সহজ ছিল না।'' ব্যাপারটা খুব স্পষ্টভাষায় ব্যক্ত হতে দেখি অধ্যাপক শুকদেব সিংহের 'রবীন্দ্র কথাসাহিত্য: উপন্যাস' গ্রন্থে। লিখেছেন, ''বিশ শতকের বিশেষত কলকাতায় ক্ষমতাসম্পন্ন এক উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে ওঠে। এ শ্রেণির সামাজিক আদর্শের অন্তর্ভুক্ত ছিলো ব্যক্তি স্বাধীনতা ও দেশোত্তর মানবতা ধর্ম। এ আদর্শের সঙ্গে সঙ্কীর্ণ দেশাত্মবোধের প্রচন্ড একটা বিরোধ বেধেছিলো। সে বিরোধই মূর্ত হয়েছে নিখিলেশ ও সন্দীপের স্বতন্ত্র জীবন-চর্যায়। বলাই বাহুল্য, নিখিলেশ এখানে মনের দিক থেকে নবোদ্ভূত উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণির।'' রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর রূপতাপস নিখিলেশের স্বদেশচেতনা একই ভূমিতলে লগ্ন তা বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথের রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লেখা চিঠির বাচনের পাশে স্ত্রী বিমলাকে বলা নিখিলেশের বক্তব্যকে পাশাপাশি রাখলে:

| রবীন্দ্রনাথ | নিখিলেশ |
| --- | --- |
| ''উন্মাদনায় যোগ দিলে কিয়ৎপরিমাণে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেই হয, এবং তাহার পরিণামে অবসাদ ভোগ করতেই হয। আমি তাই ঠিক করিয়াছি যে, অগ্নিকান্ডের আয়োজনে উন্মত্ত না হইয়া যতদিন আয়ু আছে, আমার এই প্রদীপটিকে জ্বালিয়া পথের ধারে বসিয়া থাকিব।'' | ''আমি প্রদীপ-জ্বালাবার হাজার ঝঞ্ঝাট পোয়াতে রাজি আছি, কিন্তু তাড়াতাড়ি সুবিধের জন্য ঘরে আগুন লাগাতে রাজি নই। ওটা দেখতেই বাহাদুরি, কিন্তু আসলে দুর্বলতার গোঁজা মিলন।'' |

।। ৩ ।।

"একদিন যে এই কলিকাতার মেসে দিনরাত্রি সাধনা করিয়া পড়া করিয়াছি ; গোলদিঘিতে বন্ধুদের সঙ্গে মিলিয়া দেশের কথা ভাবিয়াছি; রাষ্ট্রনৈতিক সম্মিলনীতে ভলানটিয়ারি করিয়াছি; পুলিশের অন্যায় অত্যাচার নিবারণ করিতে গিয়া জেলে যাইবার জো হইয়াছে; এইখানে জ্যাঠামশাইয়ের ডাকে সাড়া দিয়া ব্রত লইয়াছি যে সমাজের ডাকাতি প্রাণ দিয়া ঠেকাইব, সকলরকম গোলামির জাল কাটিয়া দেশের লোকের মনটাকে খালাস করিব; এইখানকার মানুষের ভিতর দিয়া আত্মীয়-অনাত্মীয় চেনা-অচেনা সকলের গালি খাইতে খাইতে পালের নৌকা যেমন করিয়া উজান জলে বুক ফুলাইয়া চলিয়া যায় যৌবনের শুরু হইতে আজ পর্যন্ত তেমনি কবিয়া চলিয়াছি – ক্ষুধাতৃষ্ণা সুখদুঃখ ভালোমন্দের বিচিত্র সমস্যায় পাক খাওয়া মানুষের ভিড়ের সেই কলিকাতায় অশ্রুবাষ্পাচ্ছন্ন রসের বিহ্বলতা জাগাইয়া রাখিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলাম।" শ্রীবিলাসের বর্ণনা করা এই কলকাতার অবসাদগ্রস্ত সমাজ-বহমানতার ভিতরের প্রবাহটা উপন্যাসে আপাতভাবে প্রকটভাবে দৃশ্যগোচর না হলেও তার কালিক স্বদেশভাবনার স্বরূপটাকে টেনে বের করে আনা কষ্টসাধ্য নয়। উপন্যাসের প্রেক্ষিতকাল মনে রাখতে হবে ১৮৯৮-৯৯ সাল : 'যে বছর কলিকাতা শহরে প্রথম প্লেগ দেখা দিল'। এই কালপর্বে জাতীয় জীবনে নিদারুণ আর্থ-সামাজিক অবনমন রাজধানী শহরের বাঙালির জীবনপ্রবণতাকে দুটো স্পষ্ট বিপরীত প্রান্তে স্থিত করে। একদিকে আত্মভোলা পরার্থ কল্যাণ চিন্তায় নিবেদিত বিবেকানন্দ প্রদর্শিত নতুন ধারার বহুজন হিতব্রত, অন্যদিকে স্বার্থপর কূপমণ্ডূক আত্মপ্রেমে মগ্ন গৃহী জীবন। নিজের জীবনধারণে প্রথমটির দিকে ঝুঁকে থেকে জ্যাঠামশাই বিদায় নিয়েছে প্লেগজনিত আকস্মিক দুর্বিপাকে। শচীশ তার প্রভাবলয়ে এলেও যথাযথ উত্তাপন না পেয়ে ফাটা ডিম থেকে ছিটকে বেরনো জৈব অবশেষ যেন। প্রাণ-অপ্রাণের মাঝামাঝি মৃত জৈবকণার দলা পাকানো নিষ্প্রাণ অবশেষ যেন সে। সমকালের বাঙালি হিন্দু বিত্তশালী শ্রেণির জীবনার্থের ট্রাজেডি বহন কবা শচীশ ওইকালে স্বদেশেরই মানব-বিগ্রহ। ভীরুতা, দায় ও দায়িত্ব গ্রহণে অপৌরুষ, গার্হস্থ্য প্রবণতার টানাপোড়েন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল যে উপনিবেশের মেট্রোপলিসে, 'চতুরঙ্গ' তার বিশ্বাসযোগ্য সমাজ আখ্যান। কেশবচন্দ্র সেন, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী যে সমাজ-মন্থনের সামাজিক বিগ্রহ — শচীশের উদ্ভব সেই সমাজমাটি থেকে। তাই 'দেশ' নয় 'রস' তার মুখ্য অন্বেষণ। পলায়নী মনোবৃত্তির অভিজাত বাঙালির সমাজ-যাপন ও তার প্রত্যক্ষ ক্লেশ থেকে উদ্ভূত অধ্যাত্মভাবুকতার নেশায় কৃত্রিম আত্মনিমজ্জন প্রযাসে ক্লিষ্ট হিন্দুসমাজের একটা খণ্ড হলেও বৃহৎকে প্রতিনিধিত্ব করা জীবনপ্রবণতার স্পষ্ট ছবি এঁকেছেন এখানে ববীন্দ্রনাথ।

'চার অধ্যায়'-এ যে সন্ত্রাসবাদী নায়ক অতীনকে নাট্যনায়ক হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে, সে তার দ্বিতীয় ভূমিকাতেই পাঠকের গ্রহণযোগ্যতা পায়। বস্তুত এখানকার পটভূমি চিত্রায়নে বিংশ শতাব্দীর সূচনাদশক থেকে বাংলায় বিকশিত সন্ত্রাস-স্বদেশীর আবহগত সাদৃশ্য পাঠককে চমকিত

করতে পারে স্বদেশ ভাবনার ফুলকি দেখার অনুভবে। তবে এটা আরোপিত গৌণ উপাদান। বুদ্ধদেব বসু যথার্থই বলেছেন, "সন্ত্রাসবাদ তাঁর বিষয় নয়, পটভূমি মাত্র; তার নৈতিক বা রাজনৈতিক দিকে তাঁর ততটুকুই কৌতূহল, যতটুকু তা অতীনের পক্ষে প্রাসঙ্গিক। তার বিভীষিকার রক্তরেখা যেখানে-যেখানে ছিটকে পড়েছে, তাও শুধু অতীনের ধ্বংসের পথটিকেই লাল তীবের মতো এঁকে এঁকে দিচ্ছে আমাদের চোখের সামনে।" রচনার সমকালে (২৯ চৈত্র ১৩৪১) অমিয় চক্রবর্তীকে পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "সাহিত্যের বাইরেও এর মধ্যে ... ঔৎসুক্যের কারণ আছে — সে হচ্ছে আধুনিক বাংলার বৈপ্লবিক মনস্তত্বের এক টুকরো ছবি। এ ঔৎসুক্য ক্ষণস্থায়ী হতে বাধ্য।"

সনাতন স্বদেশবোধ থেকে যাত্রাসূচনা করে রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষ সাড়ে তিন দশকে বিশ্বমানবতার সঙ্গে ভারতআত্মার সমন্বয়ের মধ্যেই তাঁর স্বদেশচেতনার সার্থকতা দেখেছিলেন। এই বোধ তাঁব উপলব্ধিতে পরিণতির সঙ্গে গভীরতা পেয়েছে ক্রমশ। নিমেষে দেখা 'মিলে গেছ, ওগো বিশ্বদেবতা, মোর সনাতন স্বদেশে' — এটা যেমন একটা প্রাস্থানিক উপলব্ধি, তেমনই সংঘর্ষণের সম্ভাবনার কথাও মনে রাখতে হয়। গন্তব্যপথে এবং শেষে যাত্রা অবসানের কালেও রবীন্দ্রনাথ আত্মিক সংকীর্ণতার স্বদেশভাবনার খন্দপথ বর্জনই করেছেন। তাঁর স্বদেশচেতনা এক ক্রমশ ব্যাপ্ত মানবতার চিরজীবীতাসন্ধানী। ১৯২০ সালে এন্ড্রুজকে যিনি পত্রে লেখেন, "We must make room for man, the guest of this age, and let not the nation of this age obstruct his path", তিনিই একদশক আগে গোরার মধ্যে সেই চেতনার প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছেন, শচীশের স্বার্থান্ধ আত্মমুক্তির অন্তঃসারশূন্য বিশুদ্ধতা তাঁরই তুলির ধূসরে-সবুজে আঁকা সমাজচিত্র, সন্দীপের গাঢ় গেরুয়া জাত্যভিমান ছোপানো বর্ষাধারার ক্ষণিকত্বও তিনি বাঙালি পাঠককে চিনিয়েছেন, তিনিই অতীনের জৈব বাসনার ক্ষুদ্রতা চরিতার্থতায় স্বদেশকে ভিত্তি করার কানাগলির শেষ আত্মহত্যার রোম্যান্টিক কারুণ্যের নির্মম রূপকার। 'ন্যাশনালিজম' প্রবন্ধে এই রবীন্দ্রনাথই দৃপ্ত উচ্চারণে জানান : "for the sake of humanity, we must stand up and give up warning to all that nationalism is a cruel epidemic of evil that is sweeping over the human world of the present age and eating into its moral vitality" মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশের অনুকূল সমাজ ও শাসন-প্রশাসনের প্রতিষ্ঠা এবং স্থিতির প্রতি নৈতিক দাযবদ্ধতাই রবীন্দ্রনাথের এবং তাঁর লেখা সামাজিক উপন্যাসগুলোরও কেন্দ্রিয় নির্যাস।

---

প্রবন্ধটি 'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ' - এর 'রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিক চেতনা : অন্য রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক আলোচনাচক্রে ২২ ১২ ২০১১ তারিখে উপস্থাপিত।

# রবীন্দ্র-উপন্যাসে শুভবুদ্ধি ও স্থিতপ্রজ্ঞ রাজনীতিবোধ

## ।। ১ ।।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস আজ পিছন ফিরে তৎকাল ও অনন্ত কালপ্রবাহের মাত্রায় রেখে পড়লে আশ্চর্য হয়ে দেখতে হয় কী নিদারুণ বিবেচনাবোধের অবিচলতা তাঁকে সমস্ত ভাবাবেগের মোহ থেকে নির্মোহ দূরত্ব রাখতে সাহায্য করেছিল। বিশুদ্ধ আত্মানুভূতিব প্রেরণার কাবণেই উপন্যাসে অভিব্যক্ত তাঁর তৎকালীন অনুভবরাশির নির্যাস আজও আমাদের কাছে মূল্যবান বলে মনে হয়। নগদ মূল্য বা বাজার-চলতি আদর্শের কৃত্রিম নকশা কাটা যেখানে সাফল্য পাবার চিবকালীন পন্থা, সেখানে রবীন্দ্রনাথ নিস্পৃহ, নির্লোভ। এজন্য নিজের কালে তো বটেই ভবিষ্যতের সমালোচকদের নিন্দায় তাঁকে নিন্দিত হতে হয়েছে অনেক। কিন্তু অন্তিম বিচারে তাঁর মনুষ্যত্বের প্রতি সর্বাধিক আস্থা এই ভাবুককে পৃথক আসন দিয়েছে। সে আসন শ্রদ্ধার আসন, যা সুলভে অর্জিত নয়, অজস্র নিন্দাপঙ্ক পার হয়ে অমরাবতীর চিরস্থিতির সুদুর্লভ আসন। ১৯১৭'র নভেম্বব-ডিসেম্ববে (অগ্রহায়ণ ১৩২৪) প্রকাশিত 'ছোটো ও বড়ো' প্রবন্ধে তিনি বলেন, ‘‘স্বদেশী উত্তেজনার দিন হইতে আজ পর্যন্ত আমি অতিশয় পন্থার বিরুদ্ধে লিখিয়া আসিতেছি। আমি এই কথাই বলিয়া আসিতেছি যে, অন্যায় করিয়া যে ফল পাওয়া যায় তাহাতে কখনোই শেষ পর্যন্ত ফলের দাম পোষায় না, অন্যায়ের ঋণটাই ভয়ঙ্কর ভারী হইয়া উঠে।.... দিশি বা বিলিতি যে কোনো কালিতেই হোক-না আমাব নিজের নামে কোনো লাঞ্ছনাতে আমি ভয় করিব না। আমার যেটা বলিবার কথা সে এই যে, অতিশয়-পন্থা বলিতে আমরা এই বুঝি, যে-পন্থা না ভদ্র, না বৈধ, না প্রকাশ্য; অর্থাৎ সহজ পথে ফলের আশা ত্যাগ কবিয়া অপথে বিপথে চলাকেই 'একস্ট্রিমিজ্‌ম্' বলে। এই পথটা যে নিরতিশয় গর্হিত সে কথা আমি জোরের সঙ্গেই নিজের লোককে বলিয়াছি। সেইজন্যই আমি জোরের সঙ্গে বলিবার অধিকার রাখি যে, 'একস্ট্রিমিজ্‌ম্' গবর্মেন্টের নীতিতেও অপরাধ।’’

## ।। ২ ।।

প্রথম যে উপন্যাসটিতে রবীন্দ্রনাথ সমকালেব রাজনীতির জনপ্রিয় ধারাব বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করলেন তার নাম 'গোরা'। এটি ১৩১৪'র ভাদ্র থেকে ১৩১৬'র ফাল্গুন পর্যন্ত 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসের মূল ভাবখণ্ড বিবেকানন্দ ও অরবিন্দ প্রদর্শিত হিন্দু জাতীয়তাবাদের চূড়ান্ত ব্যর্থতা। 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থভুক্ত 'বাস্তব' (শ্রাবণ ১৩২১) প্রবন্ধে তিনি

এ সম্পর্কে লিখেছেন, "আমার বিরুদ্ধে একজন ফরিয়াদি বলেছেন, আমার সমস্ত রচনার মধ্যে বাস্তবতার উপকরণ একটু যেখানে জমা হয়েছে সে কেবল 'গোরা' উপন্যাসে"।

গোরা উপন্যাসে কী বস্তু আছে না আছে উক্ত উপন্যাসের লেখক তা সব চেয়ে কম বোঝে। লোকমুখে শুনেছি প্রচলিত হিন্দুয়ানির ভালো ব্যাখ্যা তার মধ্যে পাওয়া যায়। এর থেকে আন্দাজ করছি ওটাই একটা বাস্তবতার লক্ষণ।" অথচ বিস্ময়কর যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মতো বহু বছরের ধারাবাহিক রবীন্দ্রদ্বেষী এটা বুঝলেও রবীন্দ্রবিদূষণে আদাজল - খেয়ে লেগে পড়া সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ও তাঁর দলবল তা বোঝেননি। গোরার ধর্মবিষয়ক কথোপকথন সুরেশচন্দ্রের ব্যাখ্যায় নিছকই আসার 'তর্কবিতর্ক'। অথচ দ্বিজেন্দ্রলাল একে চিহ্নিত করলেন 'ধর্মগ্রন্থ' বলে। এবং বললেন এ উপন্যাস 'বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরব'। ধর্মীয় কথার সমাজচর্চা দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষ্যে 'যেন মাণিক্যের মত পুস্তক মধ্যে বিক্ষিপ্ত আছে।' সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা করাই রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য — সেই জাতীয়তাবাদ যদি ধর্মীয় গোঁড়ামির ছায়াশ্রিত হয় তাহলেও তা প্রতিরোধনীয়। 'Nationalism' প্রবন্ধে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বললেন, ".....for the sake of humanity: we must stand up and give warning to all that Nationalism is a cruel epidemic of evil that is sweeping over the human world of the present age and eating into its moral vitality."

পরিতাপের বিষয, সমালোচনায় অতিব্যতিক্রমী বৈদগ্ধ্য দেখানোর প্রবণতাতাড়িত হয়ে পরবর্তী কালের সমালোচক শিবনারায়ণ রায় তাঁর 'সাহিত্যচিন্তা' গ্রন্থে লিখলেন, "...... উপন্যাস হিসাবে 'গোরা'কে বিশেষ উঁচুতে স্থান দেওয়া চলে না। গোরা-চরিত্র লেখকের কল্পনার একটি ভাবরূপ হিসেবে দেখা দিয়েছে। পুরো মানুষ হিসেবে বিকশিত হয়ে ওঠেনি। গোরার বক্তব্য আমাদের ভাবায় বটে, কিন্তু গোরার মনুষ্যত্ব আমাদের ক্বচিৎ স্পর্শ করে।" জটিল কালের কুম্ভীপাকের নানান আবর্তের মধ্য দিয়ে যে মানুষটা নিজের অতীতকৃতির জন্য অনুশোচনাদগ্ধ হয়ে বলছে, "বাস্তব ভারবর্ষের প্রতি সত্যদৃষ্টি মেলে তার সেবা করতে গিয়ে আমি বার বার ভয়ে ফিরে এসেছি। আমি একটি নিষ্কন্টক নির্বিকার ভাবের ভারতবর্ষ গড়ে তুলে সেই অভেদ্য দুর্গের মধ্য আমার ভক্তিকে সম্পূর্ণ নিরাপদে রক্ষা করবার জন্য আমার চারিদিকের সঙ্গে কী লড়াই না করেছি! আজ এক মুহূর্তেই আমার সেই ভাবের দুর্গ স্বপ্নের মতো উড়ে গেছে।.... আজ আমি সত্যকার সেবার অধিকারী হয়েছি, সত্যকার কর্মক্ষেত্র আমার সামনে এসে পড়েছে— সে আমার মনের ভিতরকার ক্ষেত্র নয় —সে এই বাইরের পঞ্চবিংশতি কোটি লোকের যথার্থ কল্যাণক্ষেত্র"; তার মনুষ্যত্ব 'স্পর্শ' করে না যাদের তারা কি মানসিকভাবে ভারতীয়?

## ।। ৩।।

'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের প্রেক্ষণকাল ১৮৯৮ সাল, 'যে বছর কলিকাতা শহরে প্রথম প্লেগ দেখা দিল।' আর্থ সামাজিক জীবনে এই সময়ের বাঙালি খুব একটা ভাল অবস্থায় ছিল না। প্লেগের চিকিৎসা বিষয়ে শহরবাসীর কূপমন্ডুকতার ইতিহাস থেকে এর সংকীর্ণ জীবনযাপন প্রণালীর সার্বিক

দিকটা অনুমান করে নেওয়া যায় : "...... ডাক্তাররা (বিশেষ করে সাহেব ডাক্তাররা) এসে রোগনির্ণয়ের জন্য মেয়েদের উরু ও কটির সন্ধিস্থল পরীক্ষা করবে জেনে জনগণ আরো আতঙ্কিত হল। যুগপৎ আতঙ্কে লোক শহর ত্যাগ করতে লাগল।"[২] উপন্যাসে কলকাতার এই গোঁড়া সমাজের চিত্র আছে— যারা শুধু শারীরিকভাবে নয়, মানসিকভাবেও অচিকিৎস্য। শচীশের আত্মকথায় পাই : "যে বছর কলকাতা শহরে প্রথম প্লেগ দেখা দিল তখন প্লেগের চেয়ে তার রাজ-তক্‌মা-পরা চাপরাসির ভয়ে লোকে ব্যস্ত হইয়াছিল।" কলকাতার ঘর ছেড়ে কালনার গঙ্গায় ধারে বাড়ি নিয়ে সেখানে পালাবাব আগে শচীশের বাবা হরিমোহন প্লেগে সম্ভাব্য মৃত্যুর আশঙ্কায় অগ্রিম পুণ্য লাভের উদ্দেশ্যে 'খুদে অক্ষরে দুর্গানাম লিখিয়া দিস্তাখানেক বালির কাগজ ভরিয়া' ফেলে! পুণ্য অর্জনে বাঙালি শহুরে সম্পন্ন শ্রেণির মর্মপীড়ক বর্বরতার বর্ণনা পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর ২৫ এপ্রিল, ১৮৯৯ তারিখের চিঠিতে : "...... মৃত রোগীর আত্মীয়েরা মৃত ব্যক্তির জিনিষপত্র অন্ধ আতুরদিগের মধ্যে বিতরণ করিয়াছেন"।[৩] এই কলকাতায় সেদিন 'মুক্তি', 'বন্ধন', 'গুরু', অন্তর্যামী', 'রস', 'মাধুর্য', 'প্রকৃতি', 'সহজ' প্রভৃতির দৌরাত্ম্যে যুক্তি, বুদ্ধি, জ্ঞান, মানবতা ইত্যাদির দুর্দশা সীমাহীন!

রবীন্দ্রনাথ এই স্বার্থপর কূপমণ্ডুক আত্মপ্রেমে মগ্ন গৃহী বাঙালি হিন্দুর জীবনার্থের অন্তসারশূন্যতাই দেখিয়েছেন 'চতুরঙ্গ'র রূপকাখ্যানে। এখানে বিপরীত ধারার বিবেকানন্দ প্রদর্শিত বহুজন হিতব্রতী পরার্থ কল্যাণের সমাজ-প্রবণতাটা সূচিত হলেও তার বিস্তার এবং প্রসারের দিগ্বলয় তখনও খুব ধূসর না হলেও জনতার বিশ্বাস ও আস্থা অর্জনে বেশ খণ্ডিত ও খর্ব। দেশপ্রেমের রাজনৈতিক চেতনার ধারাটা এর মধ্যে যেন অনেকটাই অন্তরালে বর্জিত। বিবর্জিত বলেই সেই যাপিত অতীতকে উপন্যাসে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উল্লেখ করেছে শ্রীবিলাস : "একদিন যে এই কলিকাতার মেসে দিনরাত্রি সাধনা করিয়া পড়া করিয়াছি; গোলদিঘিতে বন্ধুদের সঙ্গে মিলিয়া দেশের কথা ভাবিয়াছি; রাষ্ট্রনৈতিক সম্মিলনীতে ভলানটিয়ারি করিয়াছি; পুলিশের অন্যায় অত্যাচার নিবারণ করিতে গিয়া জেলে যাইবার জো হইয়াছে; এইখানে জ্যাঠামশায়ের ডাকে সাড়া দিয়া ব্রত লইয়াছি যে সমাজের ডাকাতি প্রাণ দিয়া ঠেকাইব, সকল রকম গোলামির জাল কাটিয়া দেশের লোকের মনটাকে খালাস করিব; এইখানকার মানুষের ভিতর দিয়া আত্মীয়-অনাত্মীয় চেনা-অচেনা সকলের গালি খাইতে খাইতে পালের নৌকা যেমন করিয়া উজান জলে বুক ফুলাইয়া চলিয়া যায় যৌবনের শুরু হইতে আজ পর্যন্ত তেমনি করিয়া চলিয়াছি— ক্ষুধাতৃষ্ণা সুখদুঃখ ভালোমন্দেব বিচিত্র সমস্যার পাক-খাওয়া মানুষের ভিড়ের সেই কলিকাতায় অশ্রুবাষ্পাচ্ছন্ন রসের বিহ্বলতা জাগাইয়া রাখিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলাম।"

## ।। ৪ ।।

বিপ্লববাদের নিষ্ফলতার কথা চরিত্রদের জীবনের স্খলনচিত্রের সঙ্গে যদি তাদের স্বমুখে ব্যক্ত হয়, তাহলে তা দেখানো যে লেখকের ইচ্ছাপ্রণোদিত তা অস্বীকার করার নয়। 'চার অধ্যায়'-এ অতীন

রবীন্দ্রনাথের সেই অবলম্বন। বিশ্বাস-অবিশ্বাস, নববিশ্বাস, আশাভঙ্গ, নতুন সত্যসন্ধান, পরিত্যক্ত মতকে নতুন ভাবনায় পুনর্বিচার এসব তো স্বাস্থ্যকব মানসিক সজীবতার লক্ষণ। সেই ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ যদি সন্ত্রাসবাদের নেতিবাচক দিক সম্পর্কে আবার ১৯৩৪-এ সাহিত্যাধারে তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাসকে তত্ত্বের আকারে উপস্থাপন কবেন তা দোষণীয় হবে কেন? অথচ 'চার অধ্যায়' প্রকাশের পব তা-ই হয়েছিল। ওই যে, রবীন্দ্রনাথ ১৩২৬-এর চৈত্রে 'প্রবাসী' তে লিখেছিলেন 'ন্যাশনাল সাহিত্য কূপমণ্ডূকেব সাহিত্য'—সেটাই পনের বছর পরেও ধ্রুবসত্য বলে প্রমাণ হ'ল 'চার অধ্যায়' সম্পর্কে প্রকট জাতিয়তাবাদী বিরূপতায়। কালহাঙরদের দাঁপটে প্রথম সংস্করণে সন্নিবিষ্ট 'আভাস' শীর্ষক ভূমিকাটি রবীন্দ্রনাথকে প্রত্যাহার করতে হয়। এখানেই ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর শান্তিনিকেতন আশ্রমে বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠা পর্বের সান্নিধ্যের উষ্ণতা, দীর্ঘদিন যোগাযোগ না থাকা এবং বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী সন্ত্রাস-স্বদেশীর 'অন্ধ উন্মত্ততার দিনে' জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ববীন্দ্রনাথেব কাছে ব্রহ্মানন্দের পুনর্ভু হওয়া ও আন্তরিক আলাপের পর যাওয়ার সময় "রবিবাবু, আমার খুব পতন হয়েছে" উচ্চারণের কথা লেখক উল্লেখ করেছিলেন। দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে তা প্রত্যাহৃত হয়। যদিও ১৩৪২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে 'প্রবাসী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ 'চার অধ্যায় সম্বন্ধে কৈফিয়ত' নামে যে প্রবন্ধ লেখেন তাতে তিনি ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দেন যে বিরূপ সমালোচনায় বিদ্ধ হয়ে তিনি মত বিসর্জন দেননি। লিখেছেন : "যেটাকে এই বইয়ের একমাত্র আখ্যানবস্তু বলা যেতে পারে সেটা এলা ও অতীন্দ্রের ভালোবাসা। নরনারীর ভালোবাসার গতি ও প্রকৃতি কেবল যে নায়ক-নায়িকার চরিত্রের বিশেষত্বের উপর নির্ভর করে তা নয় চারিদিকের অবস্থার ঘাত প্রতিঘাতের উপরেও।... .. ভালোবাসার....একদিকে আছে .... আন্তরিক সংরাগ, আর একদিকে তার বাহিরের সংবোধ। এই দুইয়ে মিলে তার সমগ্র চিত্রের বৈশিষ্ট্য। এলা ও অতীনের ভালোবাসার সেই বৈশিষ্ট্য এই গল্পে মূর্তিমান করতে চেয়েছি। তাদের স্বভাবের মূলধনটাও দেখাতে হয়েছে, সেই সঙ্গেই দেখাতে হয়েছে যে অবস্থার সঙ্গে তাদের শেষ পর্যন্ত কাববার করতে হল তারও বিবরণ।'

"বাইবের এই অবস্থা যেটা আমাদের রাষ্ট্রপ্রচেষ্টার নানা সংঘট্টনে তৈরি, সেটার অনেকখানি অগত্যা আমার নিজের দৃষ্টিতে দেখা, ও তার কিছু কিছু আভাস আমার নিজেব অভিজ্ঞতাকে স্পর্শ করেছে। তার সংবেদন ভিন্ন লোকের কাছে ভিন্ন রকমের হওয়ারই কথা, তার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতারও পার্থক্য আছে। কিন্তু গল্পটাকে যদি সাহিত্যের বিষয় বলে মানতে হয় তাহলে এ নিয়ে তর্ক অন্যবশ্যক, গল্পের ভূমিকারূপে আমার ভূমিকাকেই স্বীকার করে নিতে হবে।"

চরিত্র তো লেখকের কল্পনারই ভাবরূপ —তা দোষণীয় হবে কেন? গোরা বা নিখিলেশের মতো অতীনও রবীন্দ্রনাথেই কল্পনা এবং অবলোকিত কালে দেখা অবিমৃশ্যকারী সন্ত্রাসপন্থায় গা ভাসানো মনুষ্য-সমবায়ের ভাবরূপ। এই রাজনীতি সম্পর্কে ববীন্দ্রনাথের বীতরাগই প্রকাশ পেয়েছে অতীনের নৈরাশ্য বাচনে .

"মন্ত্রদাতা বললেন, সকলে মিলে একখানা মোটা দড়ি কাঁধে নিয়ে টানতে থাকো দুই চক্ষু বুজে—এই একমাত্র কাজ। হাজার হাজার ছেলে কোমর বেঁধে ধরল দড়ি। কত পড়ল চাকার তলায়, কত হল চিরজন্মের মতো পঙ্গু। এমন সময় লাগল মন্ত্র উলটোরথের যাত্রায়। ফিরল রথ। যাদের হাড় ভেঙেছে তাদের হাড় জোড়া লাগবে না, পঙ্গুর দলকে ঝাঁটিয়ে ফেললে পথের ধুলোর গাদায়। আপন শক্তির 'পরে বিশ্বাসকে গোড়াতেই এমনি করে ঘুচিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, সবাই সরকারি পুতুলের ছাঁচে নিজেকে ঢালাই করতে দিতে স্পর্ধা করেই রাজি হল। সর্দারের দড়ির টানে সবাই যখন একই নাচ নাচতে শুরু করলে, আশ্চর্য হয়ে ভাবলে একেই বলে শক্তির নাচ। নাচনওযালা যেই একটু আলগা দেয়, বাতিল হয়ে যায় হাজার হাজার মানুষ পুতুল।"

স্ফটিকস্বচ্ছ কেলাসখণ্ডের মতো রবীন্দ্রনাথের দৃঢ়-অনুভবের স্বীকৃতি আছে তাঁর কৈফিয়তে (লেখা ৮ চৈত্র ১৩৪১, মুদ্রণ 'প্রবাসী বৈশাখ ১৩৪২) : " .... এর মূল অবলম্বন কোনো আধুনিক বাঙালী নায়ক নায়িকার প্রেমের ইতিহাস। সেই প্রেমের নাট্যরসাত্মক বিশেষত্ব ঘটিয়েছে বাংলাদেশের বিপ্লব প্রচেষ্টার ভূমিকায়। এখানে সেই বিপ্লবের বর্ণনা-অংশ গৌণমাত্র; এই বিপ্লবের ঝোড়ো আবহাওয়ায় দু'জনের প্রেমের মধ্যে যে তীব্রতা যে বেদনা এনেছে সেইটেতেই সাহিত্যের পরিচয়। তর্ক ও উপদেশের বিষয় সাময়িক পত্রের প্রবন্ধের উপকরণ।" এই লেখার ঠিক একুশ দিন পর অমিয় চক্রবর্তীকে চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, "সাহিত্যের বাইরেও এর মধ্যে .....ঔৎসুক্যের কারণ আছে —সে হচ্ছে আধুনিক বাংলার বৈপ্লবিক মনস্তত্ত্বের এক টুকরো ছবি। এ ঔৎসুক্য ক্ষণস্থায়ী হতে বাধ্য।"

## ।। ৫ ।।

'ঘরে-বাইরে' সবুজ পত্রে প্রকাশকালেই এর বিরুদ্ধে নানারূপ বিরুদ্ধ সমালোচনা ছাপা হচ্ছিল বাংলাদেশের নানা প্রান্তে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়। এই উপন্যাস 'সবুজ পত্র'-র বৈশাখ থেকে ফাল্গুন ১৩২২-এ ধারাবহিক প্রকাশিত হয়েছিল। 'বরিশাল হিতৈষী' পত্রিকায় 'নভেলে রবীন্দ্রনাথ' নামক প্রবন্ধে লেখা হয়, "রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধি বাকী কোন দিকে? তিনি এখন পূর্ণ সাব। অর্থের সন্মানের অবধি নাই। দেশহিত করিতে যাইয়া তাঁহাকে এক পশুপতিনাথ বসুর বাড়ীর সভায ব্যতীত অন্য কুত্রাপি হতাশ হইতে হয় নাই। বিধির বাঁধন রাখতে গিয়ে তাঁকে জেলে যেতে হয নাই। এমনকি বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে দিয়ে একলাও চলতে হয় নাই। বরং নানা কারণে তিনি সারত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। তা সে ঋণ শোধ করিতে গিয়া তিনি ১৩২২ সালে ১৩১২ সনের ঝাল মিটাইলেন কেন?.... তিনি পরস্ত্রী মজাইবার একটা চিত্র আঁকিয়া দিলেন। ঘরে বাইরের উপসংহারে তিনি স্বদেশীর সবকার্যই দোষদুষ্ট বলিয়া বাহবা লইয়াছেন।" এই ধরণের 'অবমাননা'কর প্রবন্ধ বা চিঠির কোন জবাব না দিলেও লেখক এই উপন্যাসের শালীন অভিযোগের জবাব দিয়েছেন কয়েকটি ক্ষেত্রে। তা থেকে তাঁর রাজনীতিবোধের অন্তর্নিহিত নির্যাস বেরিয়ে আসে। ১৩২২-এর অগ্রহায়ণের 'সবুজ পত্রে' লেখা

'টীকাটিপ্পনি' নামে বেশ বড় কৈফিয়ত থেকে তাঁর শুভবুদ্ধির রাজনীতি ভাবনার প্রতি একরোখা আনুগত্য স্পষ্ট হয় : "আমাদের দেশের আধুনিককাল গোপনে লেখকের মনে যে-সব রেখাপাত করেছে ঘরে বাইরে গল্পের মধ্যে তার ছাপ পড়ছে। কিন্তু এই ছাপার কাজ শিল্পকাজ। এর ভিতর থেকে যদি কোনো সুশিক্ষা বা কুশিক্ষা আদায় করবার থাকে সেটা লেখকের উদ্দেশ্যের অঙ্গ নয়।... ঘরে বাইরে গল্প যখন লেখা যাচ্ছে তখন তার সঙ্গে লেখকের সাময়িক অভিজ্ঞতা জড়িত হয়ে পড়েছে এবং লেখকের ভালো-মন্দ লাগাটাও বোনা হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সেই রঙিন সুতোগুলো শিল্পেরই উপকরণ। তাকে যদি অন্য কোনো উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা যায় তবে সে উদ্দেশ্য লেখকের নয়, পাঠকের।. ... আমিও দেশকে ভালোবসি, তা যদি না হত তা হলে দেশের লোকের কাছে লোকপ্রিয় হওয়া আমার পক্ষে কঠিন হত না। সত্য প্রেমের পথ আরামের নয়, সে পথ দুর্গম। সিদ্ধিলাভ সকলের শক্তিতে নেই এবং সকলের ভাগ্যেও ফলে না, কিন্তু দেশের প্রেমে যদি দুঃখ্য ও অপমান সহ্য করি তা হলে মনে এই সান্ত্বনা থাকবে যে, কাঁটা বাঁচিয়ে চলবার ভয়ে সাধনায় মিথ্যাচরণ করিনি।" 'প্রবাসী' পত্রিকায় ১৩২৬-এর চৈত্র মাসে 'সাহিত্যবিচার' প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর রাজনীতি ভাবনার মতামত যে ঊনজনের দ্বারাই সমর্থিত হবে একথা জেনেই লেখেন,".... আমাদের দেশের বর্তমান কাল ছাড়াও লোক আছে,.... অন্য দেশের সহিত ভারতবর্ষের কোনো অংশে মিল নাই, সেই অমিলটাকেই প্রাণপণে আঁকড়াইয়া থাকা আমাদের ন্যাশনাল সাহিত্যের লক্ষণ —অর্থাৎ ন্যাশনাল সাহিত্য কূপমন্ডুকের সাহিত্যে।" বিস্ময়কর যে বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথের প্রতি ভাবাত্ম-নিবেদিতা আর্জেন্টিনার ভিকটোরিয়া ওকাম্পো 'ঘরে-বাইবে'র রবীন্দ্র-রাজনীতি ভাবনার অন্তঃসার যথাযথ উপলব্ধি করেছিলেন ভারত তথা বাংলার দেশজ ও সমাজ আবহের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সংশ্লিষ্টতা ছাড়াই। তিনি বলেছিলেন, "ঘবে-বাইরে'র মূল্য কখনো নষ্ট হয় না, রুশদেশের জারশাসন লুপ্ত হয়ে গেলেও 'যুদ্ধ ও শান্তি' উপন্যাসের মূল্য কমে না। অল্পবয়সীরা কিছুদিনের জন্য একটি মহৎ উপন্যাসকে উপেক্ষা করতেও পারে। কিন্তু আবেক প্রজন্ম এসে তাকে নতুন করে আবিষ্কার করে নেবে, পুরোনো তরুণেরা ততদিনে কবরে।"[১]

## ।। ৬।।

'স্বদেশ' কাব্যগ্রন্থের ২৯ সংখ্যক কবিতায় ১৯০৫ সালেই রবীন্দ্রনাথ সমকালের বাংলার রাজনৈতিক স্রোতের বিপরীত ভাবনা প্রকাশ কবে লেখেন, "আজি নিশার আকাশ/যে আদর্শে রচিয়াছে আলোকের মালা, /সাজায়েছে আপনার অন্ধকারথালা, /ধরিয়াছে ধরিত্রীর মাথার উপর, /সে আদর্শ প্রভাতের নহে মহেশ্বর।" ৩০ সংখ্যক কবিতায় লেখেন, "জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচন্ড অন্যায় /ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।" ৩১ সংখ্যাক কবিতার শেষে বলেন, "ছুটিয়াছে জাতিপ্রেম মৃত্যুর সন্ধানে / বহি স্বার্থতরী গুপ্ত পানে।" এই কাব্যিক অনুভবগুলো তাঁর স্থিতপ্রজ্ঞ রাজনীতি ভাবনাকেই প্রকাশ করেছে। রাজনীতি ভাবনায় সংকীর্ণতার খন্দপথ বিপজ্জনক একথা প্রকাশ করতে বিংশ

শতাব্দীর পরিণত জীবনপর্বে তিনি কখনই কুণ্ঠিত হননি। ১৯২০ সালে এন্ড্রুজকে পত্রে লেখেন,— "We must make room for man, the guest of this age, and let not the nation of this age obstruct his path," ১৯০৮-এ পাবনায় অনুষ্ঠিত 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলনে'র সভাপতির অভিভাষণের ছত্রে ছত্রে এই সংকীর্ণতা বর্জিত শুভবুদ্ধি জাগানোর আহ্বান ফুটে উঠেছে। অভিভাষণের শেষে বলেছেন, "ভ্রাতৃগণ, জগতের যে-সমস্ত বৃহৎ কর্মক্ষেত্রে মানবজাতি আপন মহত্তম স্বরূপকে পরম দুঃখ ও ত্যাগের মধ্যে প্রকাশ করিয়া তুলিয়াছে এই উদার উন্মুক্ত ভূমিতেই আজ আমাদের চিত্তকে স্থাপিত করিব; যে সমস্ত মহাপুরুষ দীর্ঘকালের কঠোরতম সাধনার দ্বারা স্বজাতিকে সিদ্ধির পথে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন তাঁহাদিগকেই আজ আমাদের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে রাখিয়া প্রণাম করিব; তাহা হইলেই অদ্য যে মহাসভায় সমগ্র বাংলাদেশের আকাঙ্ক্ষা আপন সফলতার জন্য দেশের লোকের মুখের দিকে চাহিয়াছে তাহার কর্ম যথার্থভাবে সম্পন্ন হইতে পারিবে।" প্রত্যক্ষ রাজনীতির আসরে ধ্বনিত এই ঔদার্য এবং শুভবুদ্ধি ও স্থিতপ্রজ্ঞ রাজনীতিবোধ তাঁর সমকালের আততি ও উত্তাপবহ উপন্যাসের বাচনেও সমানভাবে উচ্চারিত হয়েছে।

## ।। উল্লেখপঞ্জি ।।


১. 'ভারতবর্ষ : দিনপঞ্জী— ১৯১৫-১৯৪৩', রমাঁ রলাঁ, অনুবাদ অবন্তীকুমার সান্যাল, 'র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব', ১৯৮৯, পৃঃ ৮৬-৮৭

২. 'কলকাতা' উনিশ শতক/ঘটনাক্রম', শ্রীধর মুখোপাধ্যায়, 'মহাদিগন্ত', পদ্মপুকুর মোড, বারুইপুর, কলকাতা - ৭০০ ১৪৪, ২০০৮, পৃঃ ১৬৫

৩. 'পত্রাবলী', জগদীশচন্দ্র বসু, 'আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু শতবার্ষিকী সমিতি', ৯৩/১, আপার সার্কুলার রোড; কলকাতা - ৭০০ ০০৯, সম্পাদনা : শ্রী পুলিনবিহারী সেন, ১৯৫৮, পৃঃ ৭

৪. 'সভাপতির অভিভাষণ' /রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/পাবনা প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলন ১৯০৮, সংকলক : সুখেন্দুশেখর রায়, পঃ বঃ প্রদেশ কংগ্রেস, ২০১১, পৃঃ ৩৯


---

প্রবন্ধটি 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে'র 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ' এর ডি.আর.এস-১' এর জাতীয় আলোচনাচক্রে ২৯.৩.২০১২ উপস্থাপিত।

## 'চোখের বালি' : সমাজদ্বন্দ্বের অণু-পরমাণু

### ।। ১ ।।

গত শতাব্দীর সূচনায় রবীন্দ্রনাথ যখন 'চোখের বালি' (১৯০২) উপন্যাস প্রকাশ করছেন, বাঙলাপ্রদেশে তখনও গ্রাম এবং নগরের ভেদরেখা স্পষ্ট হওয়া শুরু হয়নি। সেই বাংলাদেশের' প্রধান নগরকেন্দ্র কোলকাতার বিত্তশালী হিন্দু পরিবারের গার্হস্থ্য জীবনও ছিল পিতৃ-মাতৃ তান্ত্রিক এবং মঙ্গলকাব্য ও বৈষ্ণব পদাবলীব সময়-সমাজের ভাবজীবনের উত্তরবাহী। সেখানে পিতার অনুপস্থিতিতে সংসার কর্তৃত্বেব নামে বিধবা মায়ের সার্বিক শাসন কোন কোন ক্ষেত্রে অপূর্ণ অবদমিত বাসনাব উদ্ভট প্রকাশে পর্যবসিত হোত। কিন্তু উপন্যাস লেখার ক্ষেত্রে এইরকম প্রত্যক্ষ এবং বাস্তব সামাজিক সংঘাতকে উপজীব্য কবার রীতি তৎপূর্বে প্রচলিত ছিল না। এই উপন্যাসের বিষয় নির্বাচনের দ্বারা রবীন্দ্রনাথই প্রথম উপজীব্য করলেন সেই ধরনের সমাজ-আলোড়ক্ষম পারিবারিক অণু-বিস্ফোরণ। ছেলের বিয়েকে কেন্দ্র করে বিধবা মায়ের ভাবাবেগের স্বেচ্ছাচার পারিবারিক সম্পর্কসূত্রেব বিন্যাসে কি ধরনের বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে; তা বৈজ্ঞানিকের নিষ্ঠায়, ল্যাবরেটরীর যন্ত্র-নিয়ন্ত্রকের সতর্কতায়, রক্তমাংসেব চরিত্রদের মধ্যে পরীক্ষা করার দুঃসাহস দেখালেন রবীন্দ্রনাথ। মহেন্দ্রর পছন্দ করা পাত্রীর সঙ্গে তার বিয়ে না দেবার কূট-সংকল্প মা রাজলক্ষ্মীকে যে ঘটনাধারা সংসূচিত করতে প্ররোচিত করে, তা শেষপর্যন্ত তাকেই পরিবারের কেন্দ্র থেকে উৎক্ষিপ্ত কবে বিপর্যয়ের আংশিক দায় সহনে বাধ্য করে।

'উপন্যাস' সাহিত্যের আধারে সামাজিক ব্যক্তিত্বের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণই হল 'চোখের বালি'র গঠন-পরিকল্পনার কেন্দ্রীয় মর্মনির্যাস। "বিবাহ অতিরিক্ত নরনারীর প্রেম সম্পর্ককে কবি এই পর্বেই সর্বপ্রথম জটিল মনস্তত্ত্বের অর্ন্তভুক্ত কবেছেন। চোখের বালিতে কবি শুধুই ইতিহাস সম্পর্ক বর্জিত বিশুদ্ধ সমাজজীবনের মধ্যেই প্রবেশ করেননি, মর্মস্থলে তাঁর সন্ধানী দৃষ্টির আলোকপাত করেছেন। বিধবা বিনোদিনীকে কেন্দ্র করে মহেন্দ্রের সংসারে আগুন জ্বলেছে, বিহারী ও মহেন্দ্রেব সম্পর্কে ফাটল ধরেছে।..... চোখের বালিতে শুধু নিষিদ্ধ প্রেমের উন্মেষই দেখানো হয়নি, কবি তার প্রতি পদক্ষেপ নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন এবং অশঙ্কিতভাবে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছেন। নিষিদ্ধ প্রেমের দাবানলকে পর্যন্ত জ্বালিয়ে তুলতে দ্বিধাবোধ করেননি।.....'চোখের বালি' উপন্যাসটি পঞ্চান্নটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। ঘটনার স্থান ও কালগত বাঁধুনি অত্যন্ত দৃঢ়, ঘনপিনদ্ধ। কাহিনীর মূল কেন্দ্র কোলকাতা—মহেন্দ্রের বাড়ী। দু একবার বিহারীর বাড়ীর উল্লেখ আছে। বারাসতে বিনোদিনীর, রাজলক্ষ্মীর বাপের বাড়ী। বিনোদিনীর শ্বশুরবাড়ীর উল্লেখ দুবার মাত্র আছে। দুবার কাহিনীধারা কাশীতে ছড়িয়েছে। কাহিনীর অপরিহার্য প্রয়োজনেই এগুলো ঘটেছে। উপন্যাসটি মূলত চারজন

নরনারীর কাহিনী—মহেন্দ্র, আশা, বিহারী, বিনোদিনী। অন্নপূর্ণা রাজলক্ষ্মী চরিত্রদুটি অপ্রধান ও স্বল্প পরিসর হলেও কাহিনীর দিক থেকে তারা অপরিহার্য। উপন্যাসটিতে অতিরিক্ত চরিত্রের ভিড় নেই। মাত্র চারটি চরিত্রের বিচিত্র সংঘাতের মধ্যদিয়েই এটি রচিত হয়েছে। সামাজিক উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের একটি কর্তব্য হল চরিত্রদের মনোজীবনের রহস্য বিশ্লেষণ করা। এই উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ কথাসাহিত্যিক হিসাবে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সেই বিশিষ্ট পদক্ষেপের প্রথম পরাক্রান্ত স্রষ্টার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।"[১]

উপন্যাসটিতে ঘটনার অগ্রগমন ঘটেছে সমুদ্রের ঢেউয়ের স্বতোত্থিত উচ্ছ্বাসের পর্যায়ক্রমিক উৎসারের মতো। সেই ঢেউগুলো পরস্পর এতটাই অন্তর্বিজড়িত যে এদের মধ্যে কোন কৃত্রিমতা অনুভূত হয় না। কয়েকটি পরিচ্ছেদের কাহিনী বিশ্লেষণ করলে এই সূত্রায়ন সমর্থিত হবে। প্রথম পরিচ্ছেদে বাইশ বছর বয়সী এম. এ. পাশ মহেন্দ্রের বিয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপনে বিষয়ের মুখপাত। যার সঙ্গে বিয়ে হবার কথা হয়েছিল, সেই বিনোদিনী অল্পকাল পরেই বিধবা হয়। বলাবাহুল্য বিয়ে মহেন্দ্রের সঙ্গে হয়নি। ঘটনার দ্বিতীয় উপোদ্‌ঘাত এর তিন বছর পর। প্রসঙ্গ একই—ছেলে মহেন্দ্রর বিয়ে দেবার জন্য মা রাজলক্ষ্মীর ইচ্ছা। উচ্ছ্বাসের অতিরেকে যা রাজলক্ষ্মীর মুখে এই ভাষায় ব্যক্ত হয় : " শোন ভাই মেজোবউ, মহিন কী বলে শোন। বউ পাছে মাকে ছাড়াইয়া ওঠে এই ভয়ে ও বিয়ে করিতে চায়না। এমন সৃষ্টিছাড়া কথা কখনো শুনিয়াছ? " যে ছেলের বিয়ে দিতে চায় রাজলক্ষ্মী, সেই মহেন্দ্রই বিয়ে করতে না চাওয়ায় সে 'পুলকিত' হয়। মাতৃচরিতমানসের কুণ্ডলীকৃত মনোকূট নিহিত ছিল এখানেই। অন্নপূর্ণার সঙ্গে গার্হস্থ্য মেয়েলি ঈর্ষাবৃত্ত উদ্বেজক এই বিয়ের উপলক্ষ। আশাকে পছন্দ হবেনা এমন স্বতসিদ্ধ নিয়ে মেয়ে দেখতে গিয়ে মহেন্দ্রর বিপরীত সিদ্ধান্তের ফলকথা এক পারিবারিক সঙ্কটের সূচনা। ঔপন্যাসিকের স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ বাচনে এই তৃতীয় ঢেউয়ের পবিসমাপ্তি : "এমন সময় সাজিয়া গুজিয়া গন্ধ মাখিয়া রঙ্গভূমিতে বন্ধুকে লইয়া মহেন্দ্র প্রবেশ করিলেন।" চতুর্থ ঢেউয়ের সুচনা আশার রূপে মহেন্দ্রর মুগ্ধ হওয়ায় :

১. "মহেন্দ্র সেই কম্পান্বিতা বালিকার করুণ মুখচ্ছবি দেখিয়া লইল।"

২. "মহেন্দ্রর হৃদয়ে দয়ার আঘাত লাগিল। অনাথার দিকে আর একবার চাহিয়া দেখিল।"

৩. "আশা! মহেন্দ্রর মনে হইল নামটি বড় করুণ এবং কণ্ঠটি বড় কোমল। অনাথা আশা!"

চতুর্থ ঢেউয়ের পরিণতি আশা-ভাবে ভাবিত মহেন্দ্রর ঘরে ফেরা। উপন্যাসের তৃতীয় পরিচ্ছেদে পঞ্চম ঢেউয়ে সূচনা। আশাকে মহেন্দ্রর পছন্দ হওয়ায় রাজলক্ষ্মীর ভাবনায় যে ভ্রান্ত ধারণায় জন্ম দিল তা-ই তাকে হিংস্র কুটিল করে তুলল। 'অন্নপূর্ণার চক্রান্ত' ব্যর্থ করতে তাই সে আশার পরিবর্তে 'একটি ভাল মেয়ে সন্ধান' করতে লাগল। আবার রাজলক্ষ্মীর এই ঈর্ষা কুটিলতায় অন্নপূর্ণার বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। তাই তার অভিব্যক্তি : "মহিনের সঙ্গে সম্বন্ধে আমার মত নাই।" মহেন্দ্র আশাকে বিয়ে করতে চায়, অথচ তার মা ও কাকীমা পরস্পরবিরুদ্ধ জটিল মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বে তা প্রতিরুদ্ধ করতে উদ্যত হয়েছে দেখে মহেন্দ্র আরও উত্তেজিত হয় ও রাগ করে। একটা 'দীনহীন'

ছাত্রাবাসে গিয়ে মহেন্দ্রর আশ্রয় নেওয়াতে ষষ্ঠ ঢেউযের সূচনা। শেষ পর্যন্ত আশার সঙ্গে বিয়ে দিতে রাজলক্ষ্মীর রাজি হওয়ায় এর পরিসমাপ্তি।

উপন্যাসের প্রথম তিনটি পরিচ্ছেদের ঘটনাধারার এই ছয় ধরনের ভিন্নমুখী উত্থান ও অবসানের ভিতর দিয়ে আমরা দেখতে পাই যে; উপন্যাস রচয়িতার মূল অভিনিবেশ ঘটনায় নয়, ঘটনাকে উপলক্ষ করে উপন্যাসে বিধৃত চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক ঘাত-প্রতিঘাতে। 'চোখের বালি' প্রকাশের দীর্ঘ আটত্রিশ বছর পর রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাস সম্বন্ধে মন্তব্য করেন, "আমার সাহিত্যের পথযাত্রা পূর্বাপর দেখলে ধরা পড়বে যে, 'চোখের বালি' উপন্যাসটা আকস্মিক, কেবল আমার মধ্যে নয়, সেদিনকার বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে।" রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন মনোজীবনের সঙ্গে 'চোখের বালি' উপন্যাসের বিষয়বস্তু ও টেকনিকের গভীর সম্পর্ক ছিল, কেননা এই পর্যায়ে কবির ঝোঁক পড়েছিল 'নির্মম সাহিত্য' রচনার দিকে। তাই নতুন যুগের উপন্যাসের স্বরূপ নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি স্পষ্টভাবে জানান : "ঠিক করতে হল, এবারকার গল্প বানাতে হবে এ যুগের কারখানা ঘরে। শয়তানের হাতে বিষবৃক্ষের চাষ তখনো হত, এখনো হয়; তবে কিনা তার ক্ষেত্র আলাদা, অন্তত গল্পের এলাকার মধ্যে।" কবির এই উক্তির নির্গলিতার্থ আমাদের এই সিদ্ধান্তেই উপনীত করে যে, 'চোখের বালি' উপন্যাসে তিনি বাঙালি জীবনের অতি নির্দিষ্ট পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে সুকৌশলে সূক্ষ্ম মানসিক বিপ্লবের সৃষ্টি করেছেন। এর পূর্বে রচিত বঙ্কিমীধারার উপন্যাসে চিরাচরিত সংস্কারের পাষাণ-প্রাচীরের আড়ালে প্রেমের কোন দুঃসাহসিক বৈচিত্র্য ছিলনা। 'চোখের বালি'র মাধ্যমেই রবীন্দ্রনাথ বাংলা উপন্যাসে এই নব-বৈচিত্র্য সঞ্চার করেন। শুধু রবীন্দ্র সাহিত্যে নয়, বাংলা সাহিত্যের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতা-প্রাণিত আধুনিকতার ক্ষেত্রেও যা অভিনব। বলাবাহুল্য, বিষয়ের সঙ্গে বিষয়-বিন্যাস কৌশলেও সেই আধুনিকতার ছাপ প্রকট। জটিল পারিবারিক সম্পর্ককে অবলম্বন করে, রোমান্সের স্পর্শশূন্য অতিনাটকীয়তা বর্জিত, ব্যক্তিত্বের প্রবল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াময় সংঘাত চিত্রিত এই উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে মানসিক প্রণয়াকাঙ্ক্ষা ও বঞ্চিত হৃদয়ের ঈর্ষাকাতরতা চিত্রণে শতাধিক বছর পরেও স্পন্দিত সমাজ-সত্যের আস্বাদনস্পর্শ দেয়। এখানেই 'চোখের বালি'র বিষয়ীর বা আধার ও আধেয়র অন্যোন্যবিজড়িত সাফল্যের মর্মসত্যের অবস্থান।

।। ২ ।।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রদর্শিত রোমান্স অ্যাখ্যানের ধারা থেকে বাংলা উপন্যাসকে মুক্ত করার রাবীন্দ্রিক প্রয়াসেব প্রথম রূপায়ণ 'চোখের বালি'। উপন্যাসটির সূচনা, অগ্রগতি ও পরিণতির মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাবদৃষ্টে, রবীন্দ্রনাথের প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেই এই মত ব্যক্ত করা যায় যে, বঙ্কিমী-রোমান্স ধারা মুক্ত করার এই প্রয়াসে যতটা আন্তরিকতা ছিল, তার সমতুল শক্তি ছিল না।

উপন্যাসের কেন্দ্রে আধা সামন্ততান্ত্রিকতার অন্তর্লীন প্রস্তরযুগীয় সমাজ-মূল্যবোধ ও আধা-ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের বাংলা প্রদেশের কোলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী (তৎসময়ের গ্রাম, অধুনা মফস্বল) বাঙালির পারিবারিক সংস্কারের ফলে বিপর্যস্ত দাম্পত্য ও ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ

অতৃপ্ত-অচরিতার্থ যৌবনের দিশাহীন উদভ্রান্ত আস্ফোট-যাপন চিত্রিত হয়েছে। আখ্যানের সংকট সূচিত হয়েছে ডাক্তারি পাঠরত প্রাপ্তবয়স্ক মহেন্দ্রর বিবাহ-প্রস্তাব এবং রাজলক্ষ্মীর ভাববেগের স্বেচ্ছাচার প্রকাশে। রাজলক্ষ্মীর মেজ জা অন্নপূর্ণার বোনঝি আশাকে বিয়ে করার জন্য মহেন্দ্র পছন্দ করলে রাজলক্ষ্মী তাতে অন্নপূর্ণার 'চক্রান্ত' আবিষ্কার করে। সেই মনগড়া 'চক্রান্ত' ব্যর্থ করতে মহেন্দ্রর আশাকে বিয়ে করার বাসনা ভেস্তে দিতে রাজলক্ষ্মী যুক্তিহীন অনড়তায় পরিস্থিতিকে জটিল করে তোলে। তবুও পুত্রের লাগামছাড়া মনকে শান্ত করতে রাজলক্ষ্মী আশারই সঙ্গে মহেন্দ্রর বিয়ে দিতে বাধ্য হয়। পরবর্তীকালে মহেন্দ্রর অতিরিক্ত বধূপ্রীতি দেখে রাজলক্ষ্মী সাংসারিক পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে এবং স্বসৃষ্ট আঘাতে আহত হয়ে কোলকাতার বাড়ি থেকে বারাসতে দেশের বাড়িতে চলে যায়। ইতোপূর্বে বারাসতে রাজলক্ষ্মীর এক গ্রাম-সম্পর্কিত ভ্রাতুস্পুত্রের সঙ্গে রাজলক্ষ্মীর বাল্যসখী হরিমতীর মেয়ে বিনোদিনীর বিয়ে হয়েছিল। এর মধ্যে বিনোদিনীর বৈধব্যযোগও ঘটে গেছে। শিথিল পারিবারিক ঘাত-সংঘাতের ভিতর দিয়ে আখ্যান ক্রমশ অপ্রতিহত গতিতে একমুখী হয়ে ওঠে এই বিনোদিনীর কোলকাতায় আগমন ও তাকে কেন্দ্র করে মহেন্দ্র এবং তার বাল্যবন্ধু বিহারীর ঈর্ষা ও দ্বন্দ্বপঙ্কিল সংঘাতের ফলে। সেই সংঘাত প্রশান্ত হলে প্রমদা বিনোদিনী এই দুই পুরুষ সম্পর্কে যা বোঝে তা হল : "মহেন্দ্রের ওপর নির্ভর করতে গেলে সে ভর সয়না। তাহাকে ছাড়িয়া দিলে তবেই তাহাকে পাওয়া যায়, তাহাকে ধরিয়া থাকিলে সে ছুটিতে চায়, কিন্তু নারীর পক্ষে যে নিশ্চিত বিশ্বস্ত নিরাপদ নির্ভর একান্ত আবশ্যক বিহারীই তাহা দিতে পারে।" বিনোদিনীর এই উপলব্ধি অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ নয়। পুরনো দিনের দেওয়াল ঘড়ির ঘন্টাজ্ঞাপক পেন্ডুলামের দোলকের মতো দুই পুরুষের মধ্যে নিজেকে সমপর্ণ ও বিকর্ষণ করতে করতে যে অভিজ্ঞতা সে অর্জন করে, তা এই বাল-বিধবার জীবনকে যতটা বিক্ষত করে — ততোধিক সংক্ষুব্ধ ও বিপর্যস্ত করে বিহারী এবং মহেন্দ্রর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনকে। দুই আ-কৈশোর বন্ধু পর্যবসিত হয় পরস্পরের প্রতিস্পর্ধী ও প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রুতে। সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার কেন্দ্রে থাকে বিনোদিনী। সমগ্র 'চোখের বালি' উপন্যাসে দুই পুরুষ মহেন্দ্র ও বিহারীর দ্বন্দ্বময়, জীবন্ত ও অস্থিরতা আক্ষিপ্ত জীবন চিত্রায়িত হয়েছে।

একদা দরিদ্রকন্যা বিনোদিনীর সঙ্গে মহেন্দ্র এবং বিহারীর বিয়ের প্রস্তাব হয়েছিল। কিন্তু 'বিধিনির্বন্ধে' সে বিয়ে হয়নি। আশাকে মহেন্দ্র পছন্দ করেছিল হৃদয়ে 'দয়ার আঘাত' লাগায়। সুন্দরী বিধবা বিনোদিনী রাজলক্ষ্মীর সেবিকা হিসাবে বারাসত থেকে কলকাতার বাড়িতে আনীত হলে আশা ও মহেন্দ্রর সংসারের সুখ-সমৃদ্ধি দৃষ্টে তার মধ্যে অচরিতার্থ বাসনার বিকৃত ঈর্ষা সঞ্চারিত হয়। মহেন্দ্রর বাড়িতে বিনোদিনীর উপস্থিতি বিহারীকে পীড়িত করে। তার আশঙ্কিত ভাবনা : "এ নারী জঙ্গলে ফেলিয়া রাখিবার নহে। কিন্তু শিখা একভাবে ঘরের প্রদীপ রূপে জ্বলে, আর-একভাবে ঘরে আগুন ধরাইয়া দেয়।" সেই অগ্নি প্রজ্বলনে নিজেকে দগ্ধ করার সচেতন ইচ্ছা না থাকলেও ঘটনা প্রবাহে চকমকি স্ফুরণের দায় মহেন্দ্রর সঙ্গে ভাগ করে নেয় বিহারীও।

উপন্যাসের পনেরো পরিচ্ছেদ পর্যন্ত ঘটনাবর্ত মহেন্দ্রর অন্তঃপুরের বিষয় থাকলেও ষোলতম পরিচ্ছেদের সূচনায় বিহারীর হীনমন্যতাজনিত আত্মভাবনা তাকে রঙ্গভূমির অন্যতম চরিত্রে পর্যবসিত

করে। সেই সময় সে ভাবে, "আর দূরে থাকিলে চলিবে না, যেমন করিয়া হউক, ইহাদের মাধখানে আমাকেও একটা স্থান লইতে হইবে। ইহাদের কেহই আমাকে চাহিবে না, তবু আমাকে থাকিতে হইবে।" এই হীনমন্যতা ক্রমে বিহারীকে বিনোদিনীর প্রতি মহেন্দ্রর আসক্তির প্রতিস্পর্ধী করে তোলে। প্রথমদিকে বিনোদিনীর কাছে উপহাসবিদ্ধ হলেও মহেন্দ্রর অনুগমনে প্রেম-প্রধনে প্রবেশ থেকে সে নিবৃত্ত হয়না। বিনোদিনীর প্রতি বিহারীর ঔৎসুক্য এবং তা কার্যরূপায়ণে ব্যর্থতা মহেন্দ্রকে আত্মতৃপ্ত করে। নির্বোধ আশার দ্বারা সৃষ্ট সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে মহেন্দ্র যখন বিনোদিনীব সঙ্গে অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠতায় মেতে ওঠে তখন বিনোদিনীর মন বিহারীর প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধাপন্ন হয়। অথচ তা বুঝতে না পারায় সে বিনোদিনীকে ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে। সেই সুযোগে মহেন্দ্র পুনরায় বিনোদিনীর প্রতি স্পর্ধিত ইচ্ছা চরিতার্থতার সুযোগ খুঁজতে থাকে। আশাকে কেন্দ্র করে বিহারীর নামে মিথ্যা অপবাদ লেপন ও তাকে বাড়িতে আসতে নিষেধ করা, বিনোদিনীর মুখে বিহারীর নাম শ্রবণমাত্রে আশঙ্কিত হাওয়া, যেন তেন প্রকারে বিহারীকে বিনোদিনীর থেকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা ইত্যাদি কপটাচার করেও বিনোদিনীর মন অধিকার করতে পাবেনি মহেন্দ্র। তার গৃহে আশ্রিতা বিনোদিনীর প্রতি মহেন্দ্রর অধিকারবোধ এতটাই সৃষ্টিছাড়া হয়ে উঠছিল যে নিজের অসঙ্গত ইচ্ছার সাপেক্ষে একসময় সে এই ব্যাখ্যা তৈরি করে নেয় যে, বিনোদিনী তাহার অভিভাবকতায় আছে, বিনোদিনীর ভালমন্দের জন্য সে দায়ী। অতএব এরূপ সন্দেহজনক পত্র (বিনোদিনী কর্তৃক বিহারীকে প্রেরিত পত্র — বাড়িতে বিহারী না থাকায় যা ফিরে আসে) খুলিয়া দেখাই তাহার কর্তব্য। বিনোদিনীকে বিপথে যাইতে দেওয়া কোনমতেই হইতে পারে না।" বিধবা সুন্দরী যুবতীকে 'পথ' দেখানোর আগ্রহ এতটাই তীব্র হয়ে ওঠে যে মহেন্দ্র আশার অনুপস্থিতিতে নির্জন রাত্রে বিনোদিনীর হাত চেপে ধরে বলে, "বন্ধন যখন স্বীকার করিয়াছ, তখন যাইবে কোথায়।" ভাবাবেগের এই তাৎক্ষণিক অসঙ্গত উচ্ছ্বাস মহেন্দ্রকে সাময়িকভাবে পীড়িত করে, কিন্তু সম্পূর্ণ নিবৃত্ত করে না। তাই বিহারীর প্রতি বিনোদিনীর শ্রদ্ধাপূর্ণ উক্তি শুনে পুনবায় নাটকীয়ভাবে মহেন্দ্র দুই হাতে তার পা বেষ্টন করে নিজের অদম্য প্রবৃত্তি প্রকাশ করে। এই ঘটনা চোখে পড়ে যায় বিহারীর।

মহেন্দ্রর চরিত্রের ক্ষুদ্রতা অতি সহজেই বুঝে নেবার ফলে বিনোদিনী মানসিকভাবে বিহারীর প্রতি আত্মসমর্পণ করে। এ থেকেই মহেন্দ্র ও বিহারীর পারস্পরিক সংঘাতেব সূচনা। বিহারীর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, প্রথম অবস্থায় সে আশা বা বিনোদিনী কারও প্রতিই পৌরুষের আকাঙ্ক্ষাতাড়িত না হলেও পববর্তী ঘটনাপ্রবাহে ক্রমশ বিনোদিনীকে জয় করতে চেয়েছে। কিন্তু বিহারী ছিল স্বভাবে অর্ন্তমুখী। সেই অন্তর্মুখীনতা তাকে বারবার প্রকৃত ঘটনা অনুধাবনে বিভ্রান্ত করেছে অথবা যথাসময়ে যথাবিহিত আচরণের ধারেকাছেও নিয়ে যায়নি। তাই কলকাতা, বারাসত, এলাহাবাদ, বালি — এই বিস্তীর্ণ প্রেক্ষপটে বিনোদিনী এবং মহেন্দ্রর দ্বৈত ঘূর্ণির মাঝে অবস্থান করে যখন বিহারী দৃঢ়ভাবে বিনোদিনীকে বিয়ে করার সংকল্প জ্ঞাপন করে তখন সে বিনোদিনীর লজ্জিত প্রত্যুত্তর শোনে : "তুমি চিরদিন নির্লিপ্ত, প্রসন্ন। তুমি তাই থাক — আমি দূরে থাকিয়া তোমার কর্ম করি। তুমি প্রসন্ন হও, তুমি সুখী হও।"

মহেন্দ্র এবং বিহারী —এই দ্বৈতচরিত্রের উপস্থিতিতে বিনোদিনীকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর সন্ধিলগ্নের বাঙালি উচ্চবিত্ত সমাজের যে 'মধুর মিলন' পরিণতিমূলক উপন্যাস রচনা করেছেন, তাতে দুই চরিত্রের ভাব ও কর্ম-সংঘাতে বারবার মহেন্দ্রর চরিত্রের অসংযম পাঠকের কাছে তাকে বিহারীর তুলনায় খর্ব করে দিয়েছে। অনুজপ্রতিম বন্ধুর প্রতি সে অকারণ ঈর্ষাপূর্ণ বিদ্বেষ প্রকাশে অকপট। বিনোদিনীর প্রতি তার উত্তুঙ্গ আসঞ্জনের প্রত্যাখ্যান সেই ঈর্ষাকুটিল মানসিকতাকে বিদ্বেষে রূপান্তরিত করেছে এবং সেই বিদ্বেষের একমাত্র লক্ষ্যকেন্দ্র হয়েছে বিহারী। আবার বিহারীর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, অভ্যস্ত নির্লিপ্তি তাকে অন্তরের প্রেম প্রকাশেও অসঙ্গত সংযমের বন্ধনে রুদ্ধ করেছে। তাই বিনোদিনীর প্রতি প্রেমাকর্ষণে জর্জরিত অবস্থাতেও সে বিনোদিনীকে আত্মপ্রতারক সংলাপে বিভ্রান্ত করতে চায় : ''বিনোদিনী, তোমার জীবনের সঙ্গে আমাকে তুমি জড়াইবার চেষ্টা করিতেছ কেন। আমি তোমার কী করিয়াছি। আমি তো কখনো তোমার পাশে দাঁড়াই নাই, তোমার সুখ দুঃখে হস্তক্ষেপ করি নাই।'' তার প্রতি বিহারীর যে 'শ্রদ্ধা'কে বিনোদিনী প্রেমে পর্যবসিত হবার আকাঙ্ক্ষা করেছিল তা অপূর্ণই থেকে যায়, উপন্যাসটি বস্তুতপক্ষে কোন চূড়ান্ত সত্যান্বেষণে শেষ না হাওয়ায় স্বভাবতই দুই পুরুষ চরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাত চিত্রণে রবীন্দ্রনাথ 'বিষবৃক্ষ'র একমুখী ঘটনাধারার গতানুগতিকতা থেকে অন্ততপক্ষে অবৈধ সমাজনিষিদ্ধ প্রেমকে আশ্রয় করে উচ্চবিত্ত বাঙালি পুরুষের 'আঁতের কথা'কে অনেকাংশে উন্মোচিত করতে পেরেছেন।

।। ৩ ।।

পুরুষের পরনারী সংসর্গ-আসক্তিকে পুরুষতান্ত্রিক বাঙালি সমাজ মূল্য ও নীতিবোধের মাত্রায় তেমন গুরুতর স্খলন হিসাবে চিহ্নিত করেনা। 'চোখের বালি' উপন্যাসে কোলকাতাবাসী হিন্দু-মধ্যবিত্ত মহেন্দ্রকেও উপন্যাসের ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সংসার-সংকটের শেষে তার কাকিমা অন্নপূর্ণা বলেঃ ''ছেলে ধূলা লইয়াও মার কোলে আসিয়া বসে। ...... দুই একবার ঝাড়িলেই ঝরিয়া যাইবে। মহিন, ভালোই হইয়াছে। নিজেকে ভালো বলিয়া তোর অহংকার ছিল, নিজের' পরে বিশ্বাস তোর বড় বেশি ছিল, পাপের ঝড়ে তোর সেই গর্বটুকুই ভাঙিয়া গিয়াছে, আর কোনো অনিষ্ট করে নাই।''

এই উপন্যাসের পাঠকমাত্রেই জানেন যে, অন্নপূর্ণা যাকে 'ধূলা' এবং 'পাপের ঝড়'—এই শব্দার্থের প্রতীকী ব্যঞ্জনায় অভিব্যক্ত করেছে তা হল মহেন্দ্রর মা'র বাল্যসাথী হরিমতীর সুন্দরী ও শিক্ষিতা বিধবা কন্যা বিনোদিনীর সঙ্গে মহেন্দ্রর বিবাহ-অতিরিক্ত জৈব সম্পর্কের তাড়না ও বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বিনোদিনীর দ্বারা মহেন্দ্রর প্রত্যাখ্যাত হওয়া। বস্তুতপক্ষে বিবাহিত মহেন্দ্রের বিধবা বিনোদিনীর প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার মর্মকেন্দ্র বিনোদিনীর সঙ্গে তার বিয়ে হবার সম্ভাবনা এবং বিয়ে না হওয়ার আখ্যান যতটা কার্যকর ছিল, ততোধিক অনুঘটক হয়েছিল নববিবাহিতা পত্নী আশার মধ্যে মহেন্দ্রর আকাঙ্ক্ষিত নারীত্বের অনুপস্থিতি। ঘটনাক্রমে ততদিনে বিনোদিনী বিধবা হয় এবং মহেন্দ্রর মা রাজলক্ষ্মী বারাসতে দেশের বাড়িতে যাওয়ার পর বিনোদিনী কর্তৃক রাজলক্ষ্মীকে অপরিসীম সেবার দ্বারা পরিতৃপ্ত করার সূত্রে রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে সে মহেন্দ্রর কোলকাতার বাড়িতে আনীত হয়। এরপর সমাজ-রসায়নাগারের মানসিক বীক্ষণ-আধারের মধ্যে মানবিক সংশ্লেষণের

জৈবিক নিয়মের বিক্রিয়ায় মহেন্দ্র-বিনোদিনী আসক্তি ও প্রত্যাসক্তি-বাসনার অদম্য অস্থির ঘাত-প্রতিঘাতে উপন্যাসে এক ত্রিকোণ মানবিক সংঘাতের ইতিবৃত্তান্ত চিত্রিত হয়েছে। সেই ত্রিকোণ সংঘাতের অপশূর অবস্থানে (দুরূহ ও বিপরীত কোণে অবস্থান) সংস্থিত দুই পুরুষ মহেন্দ্র ও বিহারীর অন্তঃপাতী অবস্থানে বিরাজ করে মধ্যমক্ষিকা বিনোদিনী। এই রক্তমাংস আকাঙ্ক্ষার প্রবৃত্তি-সংঘাতে গুরুত্বহীন উপস্থিতি ও গুরুভার অবসহনের জর্জর যন্ত্রণায় বিদ্ধা অন্য যে নারী-চরিত্রকে উপস্থিত থাকতে হয় সে হল মহেন্দ্রর স্ত্রী আশা। বিনোদিনীর রূপ-মাধুরীর ঐশ্বর্যে প্রলোভিত হয় মহেন্দ্র। আর বিনোদিনীর ছিল আপদনখশির কামনার অচরিতার্থতা। বাল্যবন্ধু বিহারী মহেন্দ্রর অবৈধ প্রণয়ে প্রতিরোধী থেকে প্রতিস্পর্ধী হয়ে ওঠে। কিন্তু প্রাথমিক অবলোকনে এই দ্বন্দ্ব-প্রধনের বৃত্ত-পরিধির বাইরে অথচ নিকটে থেকে যায় আশা। স্বভাতই উপন্যাস আখ্যানে এই আশা চরিত্রের সঙ্গে বিনোদিনীর মূল্য-যোজ্যতা নিরূপণ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অভিনিবেশের বিষয়।

প্রাথমিক ভাবে মেজ জা অন্নপূর্ণার বোনঝি আশার সঙ্গে রাজলক্ষ্মী তার ছেলে মহেন্দ্রর বিয়ে দিতে রাজী ছিল না। কিন্তু মায়ের সৃষ্ট বাধাবিঘ্নে উত্তেজিত মহেন্দ্র ঔদাসীন্য প্রদর্শক তাড়নায় বাড়ি ছেড়ে ছাত্রাবাসে আশ্রয় নেওয়ায় রাজলক্ষ্মী নিজের অহং বিসর্জন দিয়ে ঐ বিয়ে দিতে রাজী হয়। কিন্তু বিয়ের পর থেকেই বৌমা আশার ওপর তার কোপ পড়ে। মহেন্দ্রর 'একজামিন' ও 'পড়াশোনার ব্যাঘাত' হওয়ার সম্ভাবনার অজুহাতে রাজলক্ষ্মী আশাকে জ্যাঠার বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে চায়। এই উদ্যোগের প্রতিস্পর্ধায় নববধূ আশার প্রতি মহেন্দ্রর পক্ষপাত ও সংবেদনশীল সাহচর্য রাজলক্ষ্মীর ঈর্ষাকে বহুগুণিত করে। তার সামন্ততান্ত্রিক ভাবজীবনচর্চিত অসূয়া দ্বারা তাড়িত হয়ে রাজলক্ষ্মী নববধূর সঙ্গে তার সহাবস্থানকে উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে পীড়াদায়ক করে তোলে। এইভাবে নানান কূটিলতার আশ্রয় নিয়েও আশা এবং মহেন্দ্রর মধ্যে ব্যবধান রচনার নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে নিজ মনোবাসনার অচরিতার্থতায় অতিষ্ঠ হয়ে রাজলক্ষ্মী বাড়ি ছেড়ে বারাসতের পৈতৃক বাটীতে চলে যায়।

বারাসতের গ্রাম্য পরিবেশে আকস্মিক উপস্থিত হয়ে রাজলক্ষ্মীর চিত্ত যখন 'উদভ্রান্ত', তার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছিল; "এমন সময় বিনোদিনী আসিয়া তাঁহাকে আশ্রয় দিল এবং আশ্রয় করিল।" বিনোদিনীর আত্মসমর্পিত সেবায় মুগ্ধ রাজলক্ষ্মী একসময় ভাবে : "আহা, এই মেয়েই তো আমার বধূ হইতে পারিত। কেন হইল না।" আবেগ সংবরণ করতে না পেরে সে এমনকি বিনোদিনীকেও বলে ফেলে, "মা' তুই আমার ঘরের বউ হলিনে কেন, তোকে বুকের মধ্যে করিয়া রাখিতাম।" পুত্রবধূ আশার প্রতি রাজলক্ষ্মীর মনে যে অসূয়াবীজ ক্রমোদ্ভিন্ন হচ্ছিল তারই পরিণতিতে বিনোদিনীকে কলকাতার বাড়িতে আনা এবং ক্রমে মহেন্দ্র-আশার অন্তঃপুরে বিনোদিনীর অধিষ্ঠিত হওয়া।

আশা ও বিনোদিনীর প্রাথমিক সম্মিলন বন্ধুত্বপূর্ণ হলেও ক্রমে তা ভিন্ন মানবিক সম্পর্কের খাতে প্রবাহিত হয়। বারাসতে থাকাকালীন রাজলক্ষ্মীকে লেখা মহেন্দ্রর চিঠি পড়েই বিনোদিনীর যে প্রতিক্রিয়া উপন্যাস-বাচক বর্ণনা করেছেন তা-ই বিনোদিনীকে কলকাতায় মহেন্দ্রর বাটিতে আশ্রয় নেওয়া অবস্থাতেও চালিত করেছে। উপন্যাসের সপ্তম পরিচ্ছেদের ঐ বর্ণনা এই রকম : বিনোদিনী সেই চিঠিখানা লইয়া ঘরে ঢুকিল। ভিতর হইতে দ্বার বন্ধ করিয়া বিছানার উপর বসিয়া পড়িতে

লাগিল। চিঠির মধ্যে বিনোদিনী কী রস পাইল তাহা বিনোদিনীই জানে। কিন্তু তাহা কৌতুকরস নহে। বারবার করিয়া পড়িতে পড়িতে তাহার দুই চক্ষু মধ্যাহ্নের বালুকার মতো জ্বলিতে লাগিল, তাহার নিঃশ্বাস মরুভূমির বাতাসের মতো উত্তপ্ত হইয়া উঠিল।"

উপন্যাসের দশম পরিচ্ছেদে রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে বিনোদিনীর কোলকাতায় আগমন। এই সময় সে আশাকে প্রীতিসম্বোধনে সম্ভাবিত করে। একদিন সে আশার গলা জড়িয়ে ধরে বলে, "ভাই, তোমার সৌভাগ্য চিরকাল অক্ষয় হোক, কিন্তু আমি দুঃখিনী বলিয়া কি আমার দিকে একবার তাকাইতে নাই।" এখান থেকেই আশার জীবন বিপর্যয়ের পতন সূচিত হয়; যা উপন্যাসের বাচনে আপাতভাবে আশার হৃষ্টচিত্ততাকে আপাত-প্রকট করে : "সর্বগুণশালিনী বিনোদিনী যখন অগ্রসর হইয়া আশার প্রণয় প্রার্থনা করিল তখন সংকোচের বাধাতে ঠেকিয়াই বালিকার আনন্দ আরো চারগুণ উছলিয়া পড়িল।"

'চোখের বালি'- পরস্পরের মধ্যে অনাদরের অভিজ্ঞান এই শব্দ-সম্বোধনের স্বীকৃতিতে আশার সঙ্গে বিনোদিনীর ঘনিষ্ঠতার আকাঙ্ক্ষার অস্বাভাবিকত্ব সূচিত হয়। ক্রমশ আশা বিনোদিনীকে নিজের জীবনে এবং মহেন্দ্রর সঙ্গে তার দাম্পত্য জীবনের অবসর মুহূর্তেও টেনে আনার স্বখাত সলিল রচনা করতে থাকে। ফন্দি করে বিনোদিনীকে মহেন্দ্রর সঙ্গে মুখোমুখি আলাপ করাতে স্বতোঃপ্রণোদিত হয়ে মহেন্দ্রকে আগে থেকে বুঝিয়ে আশার কাছাকাছি হওয়ার জন্য কপট আকস্মিকতা সৃজন, নিদ্রিতা বিনোদিনীর ফোটাগ্রাফ নেবার জন্য নিজের ঘরে তাকে দুপুরে ঘুম পাড়ানো এবং সেই অবস্থায় মহেন্দ্রকে ঘরে ঢোকানো প্রভৃতির মধ্য দিয়ে মহেন্দ্র ও বিনোদিনী ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। সেই সূত্রেই আশা যে কতটা গড়পড়তা মানের (Average) বুদ্ধির অধিকারিণী তা প্রকট হয়ে যায় যুগপৎ তার বাক্য ও আচরণে। "চকোরী যে আজ চাঁদকে ছাড়িয়া মেঘের দরবারে।"—বিনোদিনীর এই কথার উত্তরে সে বলে, "তোমাদের ও সব কবিতার কথা আমার আসে না ভাই, কেন বেনাবনে মুক্তা ছড়াও; যে তোমার কথার জবাব দিতে পারিবে, একবার তাহার কাছে (মহেন্দ্রর কাছে) কথা শোনাও সে"। আবার নিদ্রিতা বিনোদিনীর ফোটোগ্রাফি নেওয়ার কৌশল তৈরির সময় আশার কৌশল-সৃজন এতটাই প্রকাশ্য হয়, যে বিনোদিনী সেই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে 'সুন্দর ভঙ্গিতে' ঘুমিয়ে পড়ে। মহেন্দ্র যখন নিদ্রিতা বিনোদিনীর পায়ের কাছে শালটা একটু বাঁদিকে সরিয়ে দিতে বলে তখন অপটু আশা মহেন্দ্রর কানে কানে বলে, "আমি ঠিক পারিব না, ঘুম ভাঙাইয়া দিব। তুমি সরাইয়া দাও।" উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর সন্ধিলগ্নে এক শিক্ষিত সচ্ছল বিবাহিত যুবকের দ্বারা সুন্দরী, মেমের কাছে পড়াশোনা করা যুবতী বিধবার শরীর স্পর্শ করে ধরা পড়ে যাওয়া এবং নিজ স্ত্রীর নির্বন্ধাতিশয্যে সেই ঘটনা ঘটার যে পরিণতি হওয়া স্বাভাবিক ছিল তা-ই ঘটেছে। বিনোদিনীর প্রতি আরক্ত অনুরাগে মহেন্দ্র নিজেকে ক্রমে পতঙ্গের অস্থিরতায় নিক্ষিপ্ত করেছে। আশা যে বিনোদিনীর প্রতি মহেন্দ্রর ক্রমবর্দ্ধমান আসক্তি নিবৃত্তিতে সক্ষম হয় না, তার মূল কারণ সংসার সম্পর্কে তার চূড়ান্ত অনভিজ্ঞতা। আখ্যানের বত্রিশ পরিচ্ছেদের সূচনায় উপন্যাস-বাচক সেই ইঙ্গিত ব্যক্ত করেছেন · "যে জায়গায় যথার্থ বিপদ সে জায়গায় তাহার চোখ পড়িল না। বিনোদিনীকে যে মহেন্দ্র ভালোবাসিতে পারে এ সম্ভাবনাও তাহার মনে উদয় হয় নাই। সংসারের অভিজ্ঞতা তাহার কিছুই ছিল না। তাছাড়া

বিবাহের অনতিকাল পর হইতেই সে মহেন্দ্রকে যাহা বলিয়া নিশ্চয় জানিয়াছিল মহেন্দ্র যে তাহা ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে ইহা তাহার কল্পনাতেও আসে নাই।''

মহেন্দ্রর সংসারে বিনোদিনীর উপস্থিতিতে যে অন্তর্দাহ ক্রমশ প্রজ্জলিত অগ্নিতে পর্যবসিত হয় তার নির্ধারক হল বিনোদিনীব আত্মবাসনা চরিতার্থতার ইচ্ছা এবং সেই ইচ্ছার সামনে অল্পবুদ্ধিসম্পন্না আশার উপস্থিতির ফলে ইচ্ছা ক্রমে ঈর্ষায় পর্যবসিত হওয়া। বিহারীর মুখে আশার সরলতাব কথা শুনে ক্রোধাবক্তা বিনোদিনীব তাৎক্ষণিক সেই ঈর্ষাক্ষুব্ধ অবস্থাকে উপন্যাস-বাচক এইভাবে বর্ণনা করেছেন : ''বিহাবী অন্ধকারে বিনোদিনীর মুখ দেখিতে পাইল না, সে মুখে হিংসার বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল। আজ বিহারীকে দেখিয়াই সে বুঝিয়াছিল যে আশার জন্য করুণায় তাহার হৃদয় ব্যথিত। বিনোদিনী নিজে কেহই নহে! আশাকে ঢাকিয়া রাখিবার জন্য, আশার পথের কাঁটা তুলিয়া দিবার জন্য, আশার সমস্ত সুখ সম্পূর্ণ করিবার জন্যই তাহার জন্ম। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রবাবু আশাকে বিবাহ করিবেন, এইজন্য অদৃষ্টের তাড়নায় বিনোদিনীকে বারাসতের বর্বর বানরের সহিত বনবাসিনী হইতে হইবে। শ্রীযুক্ত বিহারীবাবু সরলা আশার চোখের জল দেখিতে পারে না। সেইজন্য বিনোদিনীকে তাহার আঁচলের প্রান্ত তুলিয়া সর্বদা প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে। একবার এই মহেন্দ্রকে, এই বিহারীকে, বিনোদিনী তাহার পশ্চাতের ছায়ার সহিত ধূলায় লুণ্ঠিত করিয়া বুঝাইতে চায় আশাই বা কে, আর বিনোদিনী-ই বা কে। দুজনের মধ্যে কত প্রভেদ।''

বিনোদিনী যে আশার থেকে অনেক বেশি বুদ্ধিসম্পন্না ছিল তা কুড়ি এবং একুশতম পরিচ্ছেদে আশার ব-কলমে লেখা তার চিঠির ভাষার মধ্যে প্রকটিত। সেই চিঠি পড়ে মহেন্দ্র অকস্মাৎ আহত মূর্চ্ছিতের মতো স্তম্ভিত হয়ে যায়। সরলা আশা নিজের মনে করে বিনোদিনীর নির্দেশে চিঠির অন্তর্বয়নে যা লিপিবদ্ধ করেছে তা বিনোদিনীরই মনের কথা। সেই চিঠির মর্মবার্তা পড়ে মহেন্দ্র তার অবদমিত বাসনার সঙ্গে বিনোদিনীর পবোক্ষ অভিব্যক্ত আকাঙ্ক্ষার মোহনা মিলনের জন্য উদগ্র হয়ে ওঠে। আশার তৈরি করা কপট কৌশলে যে আলাপের সূচনা, আশার কাশী যাওয়ার ব্যবধানের অবকাশে তার অনুপস্থিতিব সুযোগে তা-ই দ্রুত শরীরপ্রাপ্ত হয়। রাতে মহেন্দ্রর বাড়ির নিভৃত কক্ষের স্তব্ধ নির্জনতায় বিনোদিনীর কণ্ঠস্বর মহেন্দ্রকে উদগ্র আবেশে অস্থির করে তোলে এবং ক্রমে সে নিশীথ রাতে 'বিনোদিনীর ধ্যানকে ঘনীভূত' করে তোলে।

মহেন্দ্র-বিনোদিনী ও বিহারীর ত্রিকোণ আসক্তি, ঘৃণা ও হতাশার দ্বন্দ্ব-সংঘাতের শেষে বিনোদিনী কাশীতে চলে যায়, মহেন্দ্র-আশার ভাঙা সংসারেও জোড়া লাগে আকস্মিক, বিনোদিনীকে বিয়ে করার বিহারীর দৃঢ় ইচ্ছাও অপূর্ণ থাকে বিলম্বিত অভিব্যক্তির ব্যর্থতায়। কিন্তু এই তিন চরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাতের অন্যতম অবলম্বন আশা কোনসময়েই বিনোদিনীর সমান্তরালে নিজেকে সংস্থিত করতে পারে না। মহেন্দ্রর সঙ্গে বিনোদিনীর মুখোমুখি সাক্ষাৎ ঘটানোর পর সে এদের জীবন থেকে ক্রমশ অপাঙক্তেয় হয়ে যায় কেবল এই দুই চরিত্রের উপেক্ষায় নয়, নিজের নিষ্ক্রিয় অক্ষমতাতেও। এখানেই চরিত্র হিসাবে তার তুচ্ছতা। তাই বিনোদিনী এবং আশায় প্রতিতুলনায় একথা স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, আশার বিপরীতে বিনোদিনী নয়—ববং বিনোদিনীর সমান্তরালে আশা বড়ই তুচ্ছ এবং খর্ব। সেইজন্য ত্রিকোণ প্রেমের অন্তঃস্থিত নারীদ্বন্দ্বের আধার হিসাবে বিনোদিনীর উপন্যাসন প্রতিন্যাস

জমেনি। বিহারীর প্রতি বিনোদিনীর ভৎর্সনা বাক্যে সেই সত্য গভীর, স্পষ্ট এবং অকপটে উচ্চারিত হয়েছে। বিনোদিনী এবং আশার সম্পর্ক সমান্তরাল নয়, মানসিকভাবে উচ্চতাসম্পন্ন এবং অনুচ্চতার। বিনোদিনীর ভাষায় : ''আশার মধ্যে তোমরা কি দেখিতে পাইয়াছ, আমি কিছুই বুঝিতে পারি না। ভালোই বল আর মন্দই বল, তাহার আছে কি। বিধাতা কি পুরুষের দৃষ্টির সঙ্গে অন্তর্দৃষ্টি কিছুই দেন নাই। তোমরা কী দেখিয়া, কতটুকু দেখিয়া ভোল। নির্বোধ অন্ধ!''

।। ৪ ।।

''আমার স্বামী ছিল মা-বাবার একমাত্র সন্তান, শাশুড়ি বিধবা। তার (স্বামীর) হঠাৎ তেড়ে ফুড়ে জ্বর এল একদিন। ম্যালেরিয়া মনে করে চিকিৎসা হল। শাশুড়ি খুব কেপ্পন ছিলেন, নতুন ডাক্তার দেখাব বলেও দেখালেন না। বুদ্ধি দেবারও মানুষ কেউ ছিলেন না। একরকম হঠাৎই সে চলে গেল। শাশুড়ি কাঁদলেন, আমিও কাঁদলুম। তারপর দিন আর কাটেনা। আমাদের অনেক জমিজমা গোরুবাছুর ছিল। শাশুড়ি তা থেকে ফলাপাকুড় তরি-তরকারি বেচতেন। ঘর বোঝাই থাকত শুকনো নারকোলে। কাউকে হাত তুলে দিতে পারতেন না, রোজ দু'চারটে করে ফেলা যেত। দুধ সর থেকে ছানা মাখন করেও বাজারে বেচতেন। আমাকে ঘরে শেকল দিয়ে উনি হাটে যেতেন। একদিন আমার পা লেগে মস্ত কড়া ভর্তি দুধ উল্টে গেল। শাশুড়ি উনুনের জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে তেড়ে এলেন। আমি ছুটে মাঠে গিয়ে সজনেতলায় ঝোপে লুকিয়ে রইলুম। আবার একদিন টাটকা আড়াই সের মাখন বেড়ালে খেয়ে গেল। বারকতক এই রকম হল। শাশুড়ি বুক চাপড়ে চাপড়ে শেষে কাঁদতে কাঁদতে পুকুরে ডুবে মরতে গেলেন। পাশের বাড়িতে খবর দিতে লোক এসে তাঁকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তুলে আনলো। বাড়ি এসেই বললেন, অমন অলক্ষ্মী বউ এর মুখ আর দেখবেন না। দূর করে দেবেন ইত্যাদি।''[২] যে অসহায় বিধবার এই বিবৃতি উদ্ধৃত হয়েছে, তাঁর ঠাঁই হয়েছিল কাশীতে। বলাবাহুল্য তাঁর কাশীবাস ছিল করুণ; ক্লেশকর। কিন্তু ১৯৫৫ সালে প্রদত্ত এই বৈধব্য কাহিনীর বিবৃতি বাঙালির সামাজিক যাপনের বিগত প্রায় দুই শতাব্দীর একটা সত্যার্থকেই তুলে ধরে। তা হল পরিবার ও সমাজে বিধবাদের গ্রন্থিল অবস্থান। সেই জটিল অবস্থান শুধু তাদেরই মলিন করেনি, পরিবার ও সমাজের পক্ষেও তা অনপনেয় এবং অনুপেক্ষণীয় অথচ মুক্তিপথহীন দুগর্তির কারণ হয়ে যায়। দেশ-কালের অবস্থাবিশেষে এ ছিল অবশ্যম্ভাবী। কেননা যে সমাজের সংখ্যাগত বিন্যাসে মোট নারীর পঁচিশ শতাংশই বিধবা, সেই পঁচিশ শতাংশের উপর বিপরীত জৈব শ্রেণির কর্তৃত্বব্যঞ্জক অবরোধ এবং স্বশ্রেণিভুক্ত আপাতঅর্থে দাক্ষিণ্যপ্রাপ্তাদের সঙ্গে সংঘাতের পার্শ্বিক প্রসারণ থাকবেই। Martha Alter Chen সম্পাদিত 'Widows India : Social neglect And public Action' গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে সমিতা সেন জানান, "In the late nineteenth century, the proportion of widows was highest in Bengal at 25 percent of the female population."[৩]

এই বিপুল সংখ্যক বিধবা উৎপতনের সূত্রধর রাজা রামমোহন রায়। সহমরণ রোধ করলেও উৎপতিত বিধবাদের বাঁচার মসৃণ পথ দেখানো সম্ভব হয়নি তাঁর দ্বারা। ফলে উনিশ শতাব্দীর ১৮২৯ পরবর্তী সাত দশক অখন্ড বঙ্গদেশের হিন্দু বর্ণাশ্রম সমাজের উচ্চবর্ণের প্রায় প্রত্যেকটি

পরিবারই হয়ে যায় মানব সংঘর্ষের অপচয়ক্ষেত্র। এই সংঘর্ষের ক্ষয় বেশিরভাগক্ষেত্রে বিধবাদেরই মানস-প্রক্ষোভিক এবং জৈবিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করলেও অন্যরা সেই আগুন থেকে মুক্ত ছিল না। 'চোখের বালি' উপন্যাসের প্রধান ছ'জন চরিত্রের চারজন নারী। ঐ নারীদের তিনজনই বিধবা। সহজেই বুঝতে পারি যে, তিন বিধবা নারীর বৈধব্যজনিত ক্লেশ আখ্যানবৃত্তকে প্রভাবিত করেছে তৎকালিক সমাজ ও জীবনধারার সঙ্গতি মেনেই।

ছেলে বিয়ে করতে রাজি না হওয়ায় বিধবা রাজলক্ষ্মী মুখে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করলেও, মনে মনে সে যে আত্মতৃপ্ত তা বোঝা যায়। তার আত্মতৃপ্তির কারণ, ভাবী বউয়ের সঙ্গে ভাবযোজ্যতায় মহেন্দ্র তাকে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে এমনটা বুঝতে পারায়। আবার যখন আশাকে দেখতে গিয়ে ফিরে এসে মহেন্দ্র মায়েব কাছে বিয়ে করার ইচ্ছে জ্ঞাপন করে, তখন রাজলক্ষ্মীর মনে বিকৃত চিন্তার উদ্রেক: "বুঝিয়াছি, সে দিন মেজোবউ কেন হঠাৎ তাহার বোনঝিকে দেখিতে চলিয়া গেল এবং মহেন্দ্র সাজিয়া বাহিব হইল।" এই চিন্তাভ্রূণেই সংকটের সূচনা, যে সংকট সাইক্লোনের মতো উন্মূলিত করে মহেন্দ্রকে — মাতৃভক্ত পুত্র থেকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সে পর্যবসিত হয় বউভক্ত নববর — ক্রমে বিধবার রূপমুগ্ধ কামতাড়নার্ত প্রাক-বিংশ শতাব্দীর বাঙালি নগর-পুরুষ। তখন আর সে গ্রাহ্য করেনা মাকে। এমনই অগ্রাহ্য করে যে স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথেরও বিরূপতা অর্জন করে সৃষ্টির চারদশক পরেও!

যে কালের প্রৌঢ়-বৈধব্যের জটিল মনস্তাত্ত্বিক অহং-তাড়নায় রাজলক্ষ্মী তার ছেলের দাম্পত্য জীবনকে অহেতুক বিড়ম্বনার মুখে ঠেলে দেওয়ার প্রাথমিক সংরম্ভ ঘটায়, সে কালে সাধারণ নারী মনস্তত্ত্বেব ধ্রুব বিশ্বাস ছিল এই ধারণায় যে : "পুরুষমানুষ তো স্বভাবতই বিপথে যাইবার জন্য প্রস্তুত, স্ত্রীর কর্তব্য তাহাকে ছলে বলে কৌশলে সিধা পথে রাখা"। পুরুষমানুষকে ছলে-বলে কৌশলে সিধে রাখা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সম্ভব হোতনা। সেই প্রতিহত ইচ্ছা রূপ নিত বিবিধ বিকারে। নীরদচন্দ্র চৌধুরী এইরকম একটা বিকারের বর্ণনা উদ্ধৃত করেছিলেন 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র ৩০.১.১৯৯৪ তারিখের 'খাঁটি বাঙালি ব্যভিচারিণী থাকিব — না, মেকী ইয়োরামেরিকান ব্যভিচারিণী হইব?' শীর্ষক রবিবাসরীয় সন্দর্ভে : "১৮৩১ সনের ৫ই নভেম্বর তারিখে 'সম্বাদ সুধাকর' পত্রিকাতে একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। উহাতে সম্পাদক বলেন যে, তিনি তাঁহার পত্রিকায় এক গ্রামবাসীর পত্র ছাপেন। উহাতে সেই গ্রামবাসী ব্রাহ্মণ বলিয়াছিল যে, সে কলিকাতায় আসিয়া কোনও এক প্রধান ভদ্রলোকের বাড়িতে কিছুদিনের জন্য ছিল, এবং সেখানে একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখিয়াছিল। যাহা সে দেখিয়াছিল তাহার বিববণ সম্পাদকের কথায় দিতেছি —

"দিবা অবসানে যখন ঐ বিপ্রসন্তান সায়ং সন্ধ্যা করিতে বসিয়াছিল তখন প্রথমত বাটীর বৃদ্ধকর্তা, তৎপরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ও মধ্যমপুত্র ও পরে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রও, ইহারা একে একে ভাবতেই বাটি হইতে বহির্গমন করিলেন, তৎপরে দুইজন দৌবারিক ও অন্য কোনও কোনও চাকর অন্দরমহলে প্রবেশ করিয়া নিশাবসান করিল, যাবৎ কর্ত্তা ও তাঁহার পুত্রেরা বাহিরে যামিনী যাপন করিয়া প্রাতঃকালে গৃহ প্রত্যাগমন করিলেন। এই স্থানে বিশেষ ব্যাখ্যার প্রয়োজনাভাব"।

উনিশ শতাব্দী পর্যন্ত বাঙালি জীবনাচারের এইরকম 'স্কেলিটন ইন দ্য কাবার্ড" এর অজস্র উদাহরণ আছে আমাদের সমাজ-ইতিহাসের নানান নথিতে। তাই সেই বাঙালি সম্পর্কে লেখা হয় :

"পুরুষের চরিত্রে কেচ্ছা থাকতই। থাকাটাই ছিল পৌরুষের লক্ষণ। এবং তা নিয়ে কোনবকম ঢাক ঢাক গুড়গুড় ছিল না। পুরুষেব কাম ছিল পৌরুষের নির্ঘোষ। স্ত্রী জাতিকে সম্মান করতে পারলে বাঙালি পুরুষ হয়তো এমন রগবগে বেলেল্লাপনার মধ্যে যেতে পারত না।"[৪]

স্ত্রী জাতির প্রতি মহেন্দ্রর শ্রদ্ধাহীনতা উপন্যাসে স্পষ্টতই দেখা যায়। এই উপন্যাসের একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল মহেন্দ্রকে খল প্রতিপন্ন কবেছেন লেখক। তাব মা'র প্রতি শ্রদ্ধাহীনতাও দেখিয়েছেন। কিন্তু মহেন্দ্রর মৃত বাবা বা কাকাব সম্পর্কে কোন কথাই বলেননি। তাহলে কী ধরে নিতে হবে মহেন্দ্র পিতৃ-পিতৃব্যের জীবনধারার উত্তরবাহক? তেমনটা মনে হওয়াই তো স্বাভাবিক, বিশেষত; সম্পাতবিন্দু যখন ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের কোলকাতা।

পুরুষের সম্মান ও সম্ভ্রমলাভে ব্যর্থ অথবা বঞ্চিত বাঙালি বিধবারা তাদের বৈধব্যের আগে নারীত্বের উন্মেষপর্ব থেকেই সংসারের সবকিছুকে দেনা-পাওনার সম্পর্কে গ্রহণ করতো (এবং করে এখনও)। যখন সব যোগ-বিয়োগের দ্বারাই হিসাব মেলানো অসম্ভব হয়ে যায় (অধিকাংশ ক্ষেত্রে), আয়-ব্যয় একাকার করে তারা ব্যর্থ জীবনকে সান্ত্বনা দিতে নতুন সত্যের মনগড়া স্বস্তিভাবনার খোলশে আশ্রয় নেয়। এই সাধারণ বিশ্বাস কাশীতে আশার প্রতি অন্নপূর্ণার অভিব্যক্তিতেও বেরিয়ে এসেছে : "তোর এই মাসিও একদিন তোর বয়সে তারই মতো সংসারের সঙ্গে মস্ত কবিয়া দেনাপাওনাব সম্পর্ক পাতিয়া বসিয়াছিল। তখন আমিও তোরই মতো মনে করিতাম, যাহার সেবা করিব তাহার সন্তোষ না জন্মিবে কেন। যাহার পূজা করিব তাহার প্রসাদ না পাইব কেন। যাহার ভালোর চেষ্টা করিব সে আমার চেষ্টাকে ভালো বলিয়া না বুঝিবে কেন। পদে পদে দেখিলাম, সেরূপ হয়না। অবশেষে একদিন অসহ্য হইয়া মনে হইল, পৃথিবীতে আমার সমস্তই ব্যর্থ হইয়াছে— সেই দিনই সংসার ত্যাগ করিয়া আসিলাম।" এই সংসারত্যাগী বিধবাদেব বেশিভাগই আশ্রয হোত কাশী, তদল্প সংখ্যক যেত বৃন্দাবনে। "আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময থেকে নব্যন্যাযের পীঠস্থান কাশীতে যে বাঙালি পন্ডিতদের আসার শুরু, সে ধারা পরবর্তী প্রায় দু'শো বছর নিরবচ্ছিন্ন ছিল। স্বোপার্জিত অর্থেই তাঁরা গঙ্গার ধার ঘেঁষে অজস্র বাড়ি তৈরি করে গেছেন। বাংলার বহু বিত্তশালী জমিদার ও রাজরাজড়াও কেউ পুণ্যার্জন, কেউ বা মুক্ত ব্যভিচারের নেশায় কাশীতে অঢেল সম্পত্তি বানিয়ে গেছেন। পূর্ববঙ্গের মুক্তাগাছার রাজপরিবার, নাটোরের রানি হেমন্তকুমারী কিংবা এপাবে আলমবাজারের ঠাকুরবংশ, ভূ কৈলাশের রাজবাড়ি—এ তালিকায বাদ নেই কেউই। বিদ্যাসাগরের আমল থেকে শুরু হল বাঙালি বিধবাদের স্রোত, পুণ্যক্ষেত্রে মোক্ষবাসনা এবং কিছুটা কাশীর শস্তা জীবনযাত্রা আর নিকটাত্মীয়দের আড্ডাই শেষ জীবনে তাঁদের ঠেলতে লাগল এই সুদূর প্রবাসে।"[৫] এই স্বাচ্ছন্দ্যের কাশীবাস ক্রমশ পর্যবসিত হয় বৈধব্য ও ব্যর্ধক্যের বিরহ বিমোচনের নির্বাসনে। "স্বামীর মৃত্যুর পর সম্পত্তি নিয়ে কাজিয়া, স্বার্থপর সন্তানের দায়িত্ব এড়ানোর চেষ্টা, বিধবাব সম্পত্তি আত্মসাৎ করে তাকে পথে বসানো ইত্যাদিই কারণ বিধবাদের কাশীবাসের। আত্মসম্মান বাঁচাতে বিপদ আঁচ করেই কাশী চলে এসেছেন অনেক।"[৬]

বিধবাদের সংসারের মূল স্রোত থেকে নির্বাসনের প্রক্রিয়ার অন্তর্বর্তী ছিল বহুবিচিত্র আবর্ত। কখনও গোপন অসূয়ার অপরোক্ষ প্রকাশ, কখনও সঙ্গতিবোধ অন্তর্হিত বিস্মৃত যৌনাবেশের অপ্রতিরোধ্য উদ্ভাস, কোনও কোনও ক্ষেত্রে দৃষ্টি আকর্ষণক্ষম আত্মপীড়ন ও আত্মনিগ্রহ বাঙালি বিধবাকে সংসারের অন্যান্যদের সঙ্গে সংঘর্ষে অবতীর্ণ করে। রাজলক্ষ্মীর মধ্যেও বাঙালি বিধবার এই সাধারণ চরিত্রবৈশিষ্ট্য দেখা যায়। অসুখের সময়ে মর্ষকাম প্রবৃত্তির প্রকাশে সে আত্মতৃপ্তি অনুভব করে। তাই ডাক্তারকে বলে, "কষ্টের ভালো চিকিৎসা ছিল যখন বিধবারা পুড়িয়া মরিত—আমাকে আর বিরক্ত করিয়োনা; আমি একলা থাকিতে চাই।" রাজলক্ষ্মীর এই আত্মবিবিক্ত মানসিকতার উদ্বেজক তার প্রতি ছেলে মহেন্দ্রর বিয়ের পর নিস্পৃহতা দৃষ্টে : "কাল রাত্রে তাঁহার কঠিন পীড়া দেখিয়াও মহেন্দ্র যখন বিনোদিনীর মোহে ছুটিয়া গেল, তখন রাজলক্ষ্মীর পক্ষে এ সংসারে প্রশ্ন করিবার, চেষ্টা করিবার, ইচ্ছা করিবার আর কিছুই রহিল না।" বস্তুত আশাকে মহেন্দ্র বিয়ে করার সিদ্ধান্ত জানানোর পর থেকেই রাজলক্ষ্মীর এই মনোবিকারের সূচনা। মহেন্দ্র ও আশার বিয়ের পর নবাগতা পুত্রবধূকে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিপন্নে রাজলক্ষ্মীর ভব্যতাহীন অসূয়ার আলোড়ন তাকে ভঙ্গুরতার মনোকল্পিত আশঙ্কায় সদালিপ্ত রাখে। এই পর্বে তার অভিব্যক্তিগুলো স্মরণযোগ্য :

১. উহার কোমল হাতে আমি হলুদের দাগ লাগাইয়াছি, এখন তুমি (অন্নপূর্ণা) উহাকে ধুইয়া বিবি সাজাইয়া মহিনের হাতে দাও— উনি পায়ের উপর পা দিয়ে লেখাপড়া শিখুন, দাসীবৃত্তি আমি করিব।"

২. " অভিমানিনী রাজলক্ষ্মী মনে মনে কহিলেন, মহেন্দ্র যদি এখন তার বউকে লইয়া আমার ঘরে হত্যা দিয়া পড়ে, তবু আমি তাকাইব না, দেখি সে তার মাকে বাদ দিয়া স্ত্রীকে লইয়া কেমন করিয়া কাটায়।"

৩. "ওরে বাস্‌রে! উনিই কর্তা, শাশুড়ি কেহ নয়। কাল বিয়ে করিয়া আজই এত দরদ! কর্তারা তো আমাদেরও একদিন বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু এমন স্ত্রৈনতা, এমন বেহায়াপনা তো তখন ছিল না।"

সংসারে তার 'ন্যায়ধর্ম' নিজের হৃদয়ের অনুমানে সংরচিত করে রাজলক্ষ্মী। তাই বিবাহিত মহেন্দ্রর বিবাহপূর্ব সংলিপ্ততার সামান্য বিচ্ছেদও তাকে কূট ভাবনায় কাতর করে। মহেন্দ্রর বিয়ের পর বিহারীর সঙ্গে তার কালক্ষয়ে ছেদ পড়ে। এই ঘটনা দৃষ্টিকটু বা অসঙ্গত নয়। অথচ তাও রাজলক্ষ্মীকে ভাবায়, এবং সেই ভাবনা বোধকরি বাংলা প্রবাদ-সার্থক 'মাসির দরদ' অভিধাযোগ্য : "দুদিন বউকে পাইয়া মহেন্দ্র যদি তাহার চিরকালের বন্ধুকে এমন অনাদর করে, তবে সংসারে ন্যায়ধর্ম আর রহিল কোথায়।" স্পষ্টই বোঝা যায় যে, সে নিজেও মহেন্দ্রর থেকে 'অনাদর' এর অবমাননায় বিদ্ধ ছিল। তাই এই সময়ে বিনোদিনীর কথার অনুক্রমে ভাবে : "স্ত্রীকে লইয়া মহেন্দ্র তাহার সমস্ত হিতৈষীদের দূর করিয়াছে।"

রাজলক্ষীর পুত্রস্নেহ এতটাই স্তরানৌচিত্যদুষ্ট যে মহেন্দ্রর বিয়ের বয়সেও সে তাকে শৈশব-বাল্য-কৈশোরের মতো স্নেহজলায় বদ্ধ রাখতে চায়। বারাসত থেকে বিনোদিনীকে কোলকাতার বাটিতে আনার পর তাই 'কেমন করিয়া এই অকর্মন্য একান্ত মাতৃস্নেহাপেক্ষী বয়স্ক সন্তানটিকে সর্বপ্রকার আরামে রাখিতে পারিবেন, বিনোদিনীর সহিত রাজলক্ষীর সেই একমাত্র পরামর্শ।' বস্তুত রাজলক্ষীর মধ্যে এই পুত্রবাৎসল্যের আধিক্য ঘটেছিল স্বামীর অভাবজনিত শূন্যতা পূরণের সঙ্গত তাগিদকে সহজতম চরিতার্থতায় সন্তুষ্ট থাকার অবকাশে। 'স্বামী' নামক জৈব এবং যৌন সঙ্গীর অভাবকে অসমান্তরাল 'পুত্র' নামক উৎপাদী এবং বৎসল সম্পর্কের আধারে পূরণ করার প্রতারক বাধ্যতা (একে সামাজিক বাধ্যতাই বলতে পারি ; বিধবা বিবাহ আইন থাকলেও বঙ্গীয়জীবনে সামন্ততান্ত্রিক দাম্পত্য-নৈতিকতা যার ঝুঁটি ধরে ডুবিয়ে রাখতো) রাজলক্ষীকে এক মনস্তাত্ত্বিক বিকারে সাময়িক স্বস্তি দেয়। তাই উপন্যাসে জ্ঞাপিত হয়, "স্বামীর মৃত্যুর পর হইতে সংসারে এবং সমাজে তিনি মহেন্দ্র ছাড়া আর কিছুই জানিতেন না।" এই মহেন্দ্রর বিয়ে হয়ে যাবার পর রাজলক্ষীর আহত ক্ষোভের একমাত্র লক্ষ্যবিন্দু হয়ে যায় আশা। যেহেতু আশাকে কেন্দ্র করেই মহেন্দ্রর আসক্তির আতিশয্য রাজলক্ষীকে নিজের মনোপুরক পাত্রীর সঙ্গে ছেলের বিয়ে দেবার ইচ্ছা থেকে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করেছে, তাই নিজের খর্বিত গুরুত্ব পুনরুদ্ধারে ও উচ্চতা প্রতিপন্ন করতে সে মহেন্দ্রর কাছে আশার গুরুত্বকে ক্ষুণ্ণ ও খর্ব করতে চায়। বিয়ের পর-পরই মহেন্দ্রর 'এক্‌জামিন' এর অজুহাতে আশাকে জ্যেঠার বাড়ি গিয়ে থাকার প্রস্তাব উত্থাপনের দ্বারা সেই প্রবৃত্তির অপর্যমানে অবিবেকী অহিতকামী অস্বভাবী প্রকাশ ঘটে।

সমর্পিত আনুগত্য-এটাই বুঝি কালবাহিত বাঙালি সধবা, বিধবা নির্বিশেষে প্রৌঢ়া রমনীর সংসার-স্থিতির ক্ষেত্রে একমাত্র তৃপ্তিকর চাহিদা। সেই চাহিদার পূরণ-অপূরণের দ্বন্দ্ব তাদের মেয়েলি জীবনে অশান্তির আগুন তো সম্বৎসর যাবজ্জীবন জ্বেলে রাখেই, পুরুষকেও অস্থির এবং এমনকি সংসার-উদাসীন হতে বাধ্য করে। আশার প্রতি মহেন্দ্রর আত্যন্তিক আগ্রহ ও বিয়ের ইচ্ছার প্রতিবন্ধকতা করে বিধবা রাজলক্ষী। অভিমানে মহেন্দ্র গৃহত্যাগ করে একটা 'দীনহীন' মেসে আশ্রয় নেয়। এইরকম গৃহত্যাগ উনিশ শতকীয় কোলকাতা সমাজে নজিরবিহীন নয়। উত্তর কোলকাতার সিমলেপাড়ার দুর্গাপ্রসাদ দত্ত গৃহত্যাগ করেন তার বিধবা দিদি আর বউয়ের ঝগড়া বিবাদে অতিষ্ঠ হয়ে। তার গৃহত্যাগের পটভূমি বর্ণনা এইরকম : "দুর্গাপ্রসাদ বিয়ে করেছিলেন দেওয়ান রাজীবলোচন ঘোষের ছোট মেয়ে শ্যামাসুন্দরীকে। এই শ্যামাসুন্দরীও লেখাপড়া জানতেন, 'গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিনী' নামে একটা বই লিখেছিলেন। বইটা ছাপার ব্যাপারে সব ঠিকঠাক, কিন্তু পাণ্ডুলিপিটা আচমকা হারিয়ে যায়। ... দুর্গাপ্রসাদের এক দিদি কয়েকবছর আগে বিধবা হয়ে বাপের বাড়িতে ফিরে এসেছেন, এ বাড়িতে তাঁর কথাই আইন। বাড়িতে পালকি ঢুকতে দেখে তিনিই জিজ্ঞাসা করলেন, কে আসে? আসছেন শ্যামাসুন্দরী। কয়েকদিন আগে তিনি বাপের বাড়িতে গিয়েছিলেন, এখন ফিরছেন। বিধবা ননদ আর ভাজে মাঝে মাঝেই ছুটকোছাটকা গোলমাল বাধত, আজ তা চরমে উঠল। ননদ বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে বেহারাদের সাফ বলে দিলেন, "নামাতে হবে না। পালকি আবার ফিরিয়ে নিয়ে যা।"

অপমানে চোখে জল আসছিল শ্যামাসুন্দরীর। কিন্তু পালকি ততক্ষণে আবার উল্টোদিকে ফিরতে শুরু করেছে। আর দোতলাব বারান্দায় দাঁড়িয়ে এই গোটা ঘটনাটা নিঃশব্দে দেখলেন একজন। দুর্গাপ্রসাদ।

এর পরই ঘর ছাড়লেন শ্যামাসুন্দরীর স্বামী। ঘরে বাইরে দু'জায়গাতেই তখন পুরুষের সঙ্কট। ওদিকে, বাইরে ছুটতে হচ্ছে ঘড়ির সঙ্গে তাল মিলিয়ে। আর, বাড়িতেও তার সুখশান্তির চাবি অন্যের হাতে। বিধবা দিদি কিংবা বাউন্ডুলে খুড়ো। শুধু বযসে বড় হলেই হল। ব্যস, মেনে নিতে হবে তাব সব নির্দেশ।''[৭]

বিযেব পরই বৌমা আশার থেকে সমর্পিত আনুগত্য লাভের সুযোগ হয়নি বিধবা রাজলক্ষীর। সেই সুযোগ সে পেয়েছে বিনোদিনীকে নিয়ে মহেন্দ্র নিরুদ্দেশ হয়ে যাবার অবসরে। তখন 'গৃহের বধূ শাশুড়ির পদতলের অধিকার' পায়। এই আনুগত্যতৃষিতা রাজলক্ষীর চরিত্রবৈশিষ্ট্য উভয়ের এক উত্তেজক বাক্যালাপের মুহূর্তে উন্মোচিত করে দেয় বিনোদিনী : ''তুমি কি কখনো তোমার বউয়ের উপব দ্বেষ কবিয়া এই মায়াবিনীকে দিয়া তোমার ছেলের মন ভুলাইতে চাও নাই। একবার ঠাওর করিয়া দেখো দিকি।'' বিনোদিনী ইতোপূর্বে একবার রাজলক্ষীকে বলে, ''আমরা মায়াবিনীর জাত্‌, আমার মধ্যে কী মায়া ছিল তাহা আমি ঠিক জানি নাই, তুমি জানিযাছ; তোমাব মধ্যেও কী মায়া ছিল তাহা তুমি ঠিক জান নাই, আমি জানিয়াছি। কিন্তু মায়া ছিল, নহিলে এমন ঘটনা ঘটিত না। ফাঁদ আমিও কতকটা জানিয়া এবং কতকটা না জানিয়া পাতিয়াছি। ফাঁদ তুমিও কতকটা জানিয়া এবং কতকটা না জানিযা পাতিয়াছ। আমাদের জাতের ধর্ম এইরূপ — আমরা মায়াবিনী।''

বৈধব্যের গ্লানি বিনোদিনীর মধ্যে সর্বাধিক বিকার সৃষ্টি করাটা খুব স্বাভাবিক। কেননা সে তখনও বিশবছর বয়সের আশপাশে। সে মহেন্দ্রকে প্রলুব্ধ করেছিল নিদারুণ অভাবের তৃষ্ণায়। সে তৃষ্ণা যতটা না বৈভব গ্রাসের, ততোধিক আগ্রাসী বিলাস-স্রোতের মিঠে জলে অবগাহন করে জৈব-শবীর পরিতৃপ্ত করায় : ''মহেন্দ্রের ঘরের অজস্র সচ্ছলতা, বিলাস-উপকরণ এবং সাধারণের কাছে ধনী বলিয়া তাহাদের গৌরব, এক কালে বিনোদিনীর মনকে আকর্ষণ করিয়াছিল। সে যে অনায়াসেই এই ধনসম্পদ, এই-সকল আরাম ও গৌরবের ঈশ্বরী হইতে পারিত, সেই কল্পনায় তাহার মনকে একান্ত উত্তেজিত করিয়া তুলিযাছিল।''

জৈবিক জীবন অতিবাহনের জন্য অহরহ লাঞ্ছিত হওয়া এবং সুযোগ পেলে অধঃস্তনের প্রতি অসৌষ্ঠব লাঞ্ছনাকর ব্যবহার ও পরিস্থিতি সৃজন করা — এটাই যেন বাঙালি বিধবার নিয়তিতাড়িত জীবনলিপি। সমাজে এবং উপন্যাসে এই সত্যের কোন ব্যতিক্রম নেই। মহেন্দ্র যখন আশাকে মানসিক এবং জৈবনিকভাবে পরিত্যাগ করে বিনোদিনীর প্রতি পূর্ণবেগে প্রধাবিত, তখন মহেন্দ্রর গৃহে প্রত্যাগত হয়েও প্রস্থানের দায় রাজলক্ষী চাপিয়ে দিতে চায় আশার ওপরেই। 'কাল মহিন কখন গেল?'-এই প্রশ্নে আশার অজ্ঞতাসূচক উত্তর পেযে রাজলক্ষীর রেগে ওঠা অভিব্যক্তি, ''তুমি কিছুই জাননা। কচি খুকি। তোমার সমস্ত চালাকি।'' তদুপরি 'আশারই আচরণে ও স্বভাবদোষেই যে মহেন্দ্র গৃহত্যাগী হইয়াছে, এ মতও রাজলক্ষী তীব্রস্বরে ঘোষণা করিয়া দিলেন'। এই

সরব 'লাঞ্ছনা'ব আগেও একই ঘটনা উপলক্ষে আশাকে রাজলক্ষীর 'নীরব লাঞ্ছনা'য় বিদ্ধ করার বর্ণনা উপন্যাসের চল্লিশ পরিচ্ছেদের শেষে পাওয়া যায়।

'চোখের বালি' এমন এক যুগ-সমাজের জীবনকথা যেখানে যুগবাহিত পারিবারিক সংস্কারের প্রাধান্য। সেই প্রাক্-বিংশ শতাব্দীর ইংরেজ-সান্নিধ্য-অর্জিত কোলকাতার অর্থ-আভিজাত্যময় ধনী বাঙালি হিন্দু পরিবারে ছেলের বিয়েকে কেন্দ্র করে বিধবা মায়ের অসংস্কৃত, অসংযত ভাবাবেগের স্বেচ্ছাচার অসংবৃত হয়ে পড়ে। সেখানে পারিবারিক অবস্থানে পুত্রবধূ নির্বাচনের ক্ষেত্রে ছেলের ইচ্ছা-অনিচ্ছা-রুচির ঊর্ধ্বে মায়ের পছন্দ নির্ধারিত হোত তার 'কুটুম্বের সুখ', 'কুল'যোজ্যতা ইত্যাদির মানদন্ডে। সেই নির্ধারণ ইচ্ছায় নিশ্চয়ই অন্তর্লীন থাকতো অবদমিত, অচরিতার্থ যৌন-মনস্তত্ত্বের কুন্ডলীকৃত মনোতরঙ্গের অন্তর্বেদনা ও অর্ন্তদাহ। প্রকৃতিবিরুদ্ধ শুদ্ধতার প্রতিমূর্তি সেই বাঙালি মা-কাকিমা-ঠাকুরমা-পিসীমাবা পরবর্তী প্রজন্মের ওপর তাদের অজ্ঞাতসারেই নামিয়ে দিত একই নির্যাতিত বেদনার ভার। আত্মক্ষয়ী এই গৃহযুদ্ধ আজও নির্বাপিত হয়নি। তাই, 'পিতুরোপ্যধিকা মাতা গর্ভধারণ পোষণাৎ, অতো হি ত্রিষুলোকেষু নাস্তি মাতৃসমগুরু' ইত্যাদি শাস্ত্রবচন ঢাকা পড়ে যায় সংসার-সংঘাতের আবিল কোলাহলে। আজও কাশী-বৃন্দাবন/বিধবার নির্বাসন শব্দানুসঙ্গে অনুপ্রাসিত হয়। 'চোখের বালি'র মধুর মিলন আখ্যানে রবীন্দ্রনাথ মহেন্দ্রকে ঘরে ফিরিয়ে, বিনোদিনীকে কাশী পাঠিয়ে, রাজলক্ষীর দ্বারা বিনোদিনীকে স্বস্তিবাক্যে স্নান করালেও ("বউ, তোমা হইতে কাহারো মন্দ না হউক, তুমিও ভালো থাকো"), আমরা বঙ্গ জীবনের এই প্রজন্ম পরম্পবাব সংকটকে ছোট করে দেখলে উপন্যাস অধ্যয়ন খন্ডিত থেকে যাবে।

## ।। উল্লেখপঞ্জি ।।


১। "ববীন্দ্রনাথেব উপন্যাস · চোখের বালি", রথীন্দ্রনাথ বায়, 'শাবদীয় প্রবন্ধ পত্রিকা' ১৩৬৭, পৃ ৫৬

২। কল্যাণী দত্ত, "বিধবা কাহিনী", 'এক্ষণ' শাবদীয় ১৩৯৮, পৃ. ৬২

৩। Samita Sen, "Surviving Husbands", 'The Statesman' 15.3.1999, Review page No. 1

৪। রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায, "কেচ্ছা পুবাণ," "আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৫ ৬ ১৯৯৭, রবিবাসরীয পৃ ১

৫। শুভজ্যোতি ঘোষ, 'কাশীছাড়া', 'আনন্দবাজাব পত্রিকা', ১৩ ৬.১৯৯৮, পৃ. ১

৬। অমিতেশ মাইতি, 'এবকম অসহায দৃষ্টি আগে দেখিনি, 'সংবাদ প্রতিদিন', ৬.২ ২০০০, পৃ ক

৭। গৌতম চক্রবর্তী, 'বাঙালির সব সুখ কেড়ে নিল মামুলি একটা ঘড়ি', 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ববিবাসবীয ২.১.২০০০, পৃ ১৩


---

প্রবন্ধটিব প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি, ২০০২

# শতবর্ষে গোরা : অভিজাত বাঙালির অসার ধর্মকোন্দলের কথাগদ্য

।। ১ ।।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতা শিবনাথ শাস্ত্রী ওই সমাজের সদস্য নরেন্দ্রনাথ দত্তকে বলেন, 'দক্ষিণেশ্বরে যেওনা, অত্যধিক কৃচ্ছ্রসাধন করে রামকৃষ্ণের মস্তিষ্ক বিকৃতি হয়েছে; তাঁর সমাধি স্নায়ু দৌর্বল্য ছাড়া আব কিছু নয়'। আবার জনৈক রাম নামক ভক্তকে রামকৃষ্ণ বলেন, 'কেশবের সংসার ছিল কাজে কাজেই সংসারেব উপব মনও ছিল। সংসারটিকে তো রক্ষা করতে হবে। তাই অত লেকচাব দিয়েছে, কিন্তু সংসারটি বেশ পাকা কবে রেখে গেছে। অমন জামাই! বাড়ির ভিতরে গেলুম, বড় বড় খাট। সংসার করতে গেলে ক্রমে সব এসে জোটে। ভোগের জায়গাই সংসার।'' — তিনজন মানুষের আপাত-হৃদ্যতার ভিত্তিতলে পরস্পবের জীবনাচরণের প্রতি প্রকৃত মনোভাবটা বেরিয়ে এসেছে এতে। কালধর্মই দুই ধর্মগুরুকে একথা বলিয়ে নিয়েছে। উনিশ শতাব্দীর যে কালপটে এই দুই ব্যক্তিকে ব্রাহ্ম এবং হিন্দু অধ্যাত্মবাদীরা বিশেষ ধারক বলে চালাবার চেষ্টা করেন, সেটা আসলে কলকাতা ও তার প্রভাব-বিস্তৃত অঞ্চলের বাঙালি অভিজাত হিন্দুর জীবনার্থ খোঁজার দিশাহীন কানামাছি খেলার কাল। এই কালের বিস্তার মোটামুটি ১৮৫৭' র পরবর্তী পঞ্চাশ বছর। ১৯০৭ - ১৯০৯'এ লিখিত 'গোরা' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ নিজের জন্ম থেকে বেড়ে ওঠা কলকাতার এই কালকে আত্ম-অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে অনুভব করে ব্যাখ্যা কবতে চেয়েছেন। এই কালভাষ্যেব কেন্দ্রীয় সত্য সঙ্কীর্ণ ধর্মীয কোন্দলে লিপ্ততা এবং আত্মাভিমান জাহির করা। ১৯১০ সালের ৮ জানুয়ারি কেশবচন্দ্র সেনের জন্মোৎসবে 'স্কটিশচার্চ কলেজ'-এর সভায় সভাপতির ভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলেন, ''. . . যখন আমি বালক, কিছু কিছু জ্ঞান হইযাছে, তখন ব্রাহ্ম সমাজের বিরোধের সময়। আমার মনেও সেই বিরোধের ভাব, আমার মনে হইতো, তিনি (কেশবচন্দ্র) যে ধর্ম, যে সত্য প্রচার করিতেছেন, তাহা আমাদের স্বদেশীয নহে, বিদেশীয। তাহাকে লইয়া যখন খুব গোলমাল হইতেছে, তখন তার প্রতি আমার একটা বিরোধভাব আসিয়াছিল, এটা আমার বেশ মনে আছে। তখন বোল ছিল স্বদেশী। এই তখন দম্ভ, দর্প ছিল। আমার মনে হইতো বুঝি আমাদের স্বদেশের যে মাহাত্ম্য আছে, বুঝি সে মহাপুরুষ সেই গৌরব খর্ব করিয়াছে''।

বাঙালি জীবনে উনিশ শতাব্দীর এই শেষ চার-দশক নিঃসন্দেহে বিশেষ এক যুগ। এই মিশ্র সঙ্কর ভাষাজাতির জীবনের সর্ববিস্তারে না হলেও, বিকাশমান নগরকেন্দ্রিক শিক্ষিত অভিজাতদের

জীবন নানান ভাবপ্লাবনে বারংবাব উচ্ছ্বসিত হয়েছে। এই কালের ভিতরেই কাব্য, উপন্যাস ও নাটকে আধুনিকতার সঞ্চারী উন্মেষ। নাটক তো কড়ির মূল্যে 'হাড়ি শুড়ি' নির্বিশেষে সর্বসাধাবণের 'বাহার' দেখার মঞ্চে নেমে এসেছে। আপন বলবীর্য লাভের দ্বাবাই অর্জিত হবে স্বাধীনতা — এমন স্বপ্নের তাড়নায় প্রকাশ্য ময়দানে শরীর-স্বাস্থ্য চর্চিত হতে শুরু করেছে সঙ্ঘ প্রেরণায়। নাট্যমঞ্চে পুবাণ-প্রেতের নৈমিত্তিক নৃত্য—নিত্যদিনের আসর মাত করেছে হাতিবাগান, শ্যামবাজাব আর শোভাবাজারে। একের পব এক বিধানের নতুনত্বে জন্ম নিয়েছে তিন-তিনটি ব্রাহ্মসমাজ (২০.৮ ১৮২৮ 'আদি ব্রাহ্মসমাজ', ১১.১১.১৮৬৬ 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' ও ১৫.৫.১৮৭৮ 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ', এবং ২৬.১.১৮৮০ 'নববিধান ব্রাহ্মসমাজ')। উৎসে এবং ভিত্তিমূলে হিন্দুজীবনের ঐতিহ্যসার থাকলেও খ্রিস্ট-দর্শনের সারকেও আত্মসাৎ করেছেন 'মহাবিশ্বলোক উৎসারিত আলো'র ('Heavens Light Our Guide') দ্বারা চালিত ব্রহ্মজ্ঞানীরা। ইসলাম তাঁদের চিন্তায় গুরুত্ব পায়নি— যদিও গবিষ্ঠ বাঙালি ইস্লামধর্মী চাষাদের ভূমিশ্রমের উপস্বত্ব আহরণ করেই চলছিল এইসব চিদাত্মা উৎকর্ষের ধ্যান-ধার্মিকতা ! এই সমাজেব সঙ্গে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে জড়িত মুৎসুদ্দি, বেনিয়ান ও জমিদাররা তাঁদের আকাক্ষাপূবক মঞ্চ গড়ে তুলেছেন 'ভারতসভা' (২৬ জুলাই ১৮৭৬), 'ব্রিটিশ ইন্ডিযান অ্যাসোসিয়েশন' ও 'ভারতের জাতীয় কংগ্রেস' (২৮.১২.১৮৮৫) নামে। সমান্তরালে লোকায়ত জীবনপ্রবাহে চলেছে ক্ষয়িত কলকাতার বুলবুলির লড়াই, বাঈ নাচ, খেউড়-খেমটার আসর আব মূর্খ ধনীর স-বংশ বেশ্যাসক্তির জীবন্ত জৈবিকতা! রাধাকান্ত দেব, মতিলাল শীলদের ঐতিহ্য অন্ধতাও উল্লেখযোগ্য। এই কলকাতার ব্রাহ্ম-হিন্দু অভিজাতদের ব্রাহ্মণ্যবাদী অনুদারতা, সঙ্কীর্ণতা, পারস্পবিক ঘৃণা, দলবাজি, বিবেকহীনতা, হিংসা-ক্রোধ-পরনিন্দা-অহঙ্কার ইত্যাদিতে পূর্ণ জীবনচিত্র 'গোরা'।

।। ২।।

শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস-সাহিত্যের মধ্যে নয়, বাংলা উপন্যাসেরই একটি বিশিষ্ট মাইলস্টোন 'গোরা'। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহ পরবর্তী বাঙালিব ভাবমানসের পবিচয় অনবদ্য শিল্পনৈপুণ্যে বিধৃত হয়ে রয়েছে 'গোবা' উপন্যাসে। উপন্যাসেব ঘটনাস্থল কলকাতা। পাত্র-পাত্রী যথা গোরা, তার বন্ধু বিনয়, পরেশবাবু ও কন্যাদ্বয় ললিতা ও সুচবিতা, গোরার মা আনন্দময়ী, বাবা কৃষ্ণদয়াল প্রভৃতি প্রত্যেকেই ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ-শাসিত ভারতের রাজধানী কলকাতা শহবের অভিজাত নাগরিক উচ্চবিত্ত সমাজের মানুষ। একটি বিশেষ যুগেব ধর্ম সংক্রান্ত বিবাদ-বিতর্ককে আশ্রয় করে পল্লবিত হলেও গোবা এবং সুচরিতার পারস্পরিক আসক্তি, প্রেম এবং আত্মোপলব্ধি কাহিনীর অনেকটা জুড়ে আছে এবং পাঠককে প্রাপ্তবয়স্ক অবিবাহিত যুবক-যুবতীব ধর্মীয় গোঁড়ামির খোলস ত্যাগ করা মানবিক প্রেমের আততি ও পরিণতির স্বাদ দিয়েছে। উপন্যাসেব মধ্যে ছিয়াত্তরটি পরিচ্ছেদ এবং পরিশিষ্ট সমেত প্রায় মহাকাব্যিক আয়তন-বিস্তারে তৎকালীন কলকাতার নবোদ্ভূত ব্রাহ্মসমাজ এবং প্রাচীন হিন্দু সমাজ— এই দুই পবস্পর-প্রতিস্পর্ধী ধর্ম সম্প্রদায়েব বিরোধের মধ্যে দিয়ে লেখক সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা, সংকীর্ণতা আচ্ছন্ন সাম্প্রদাযিকতার বিরোধিতা

এবং জাতীয়তাবাদের ঊর্ধ্বে মানবতার জয়গান গেয়েছেন। উপন্যাসে মধ্যযুগের মূল্যবোধ ত্যাগ করে আধুনিক যুগের আবির্ভাব-চিহ্ন ঘোষিত হয়েছে। এর উপজীব্য সমস্যা ও সংকট যেন একা গোরার নয়, তার কালের সমস্ত আত্মসচেতন ভারতীয় যুবকের। মনে হয় এ সংকট শাশ্বতকালের ভারতীয় যুবকের — কালকে অতিক্রম করে যা আজও প্রাসঙ্গিক।

হিন্দুগৃহে প্রতিপালিত আইরিশ সন্তান গোরার উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে ঔপন্যাসিকের এই ভাবাদর্শের প্রকাশ ঘটেছে। যে গোরা নিজে হিন্দু না হয়েও জন্মকাহিনী সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার ফলে বাহ্যিক জীবনযাপনে হিন্দুত্বের মহিমাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরার প্রয়াস করে, হিন্দু ব্যতীত আর সবাইকে ম্লেচ্ছ ভাবার কূপমণ্ডুকতা নিয়েই সে ব্রাহ্ম পরেশবাবুর পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার মধ্য দিয়ে সংঘাত এবং মানসিক সংঘর্ষ পেরিয়ে উপন্যাসের শেষে পৌঁছে বিপরীত বোধে স্থিত হয়। তার জীবনটাই নতুন বাঁকবদলের কালসন্ধিতে স্থিত হয়। একসময়ের রক্ষণশীল চরম হিন্দু গোরা উচ্চারণ করে : "আমি আজ ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান কোন সমাজের কোন বিরোধ নেই। আজ এই ভারতবর্ষের সকলেব অন্নই আমার অন্ন।" এ যেন গোরার আত্ম-পরিবৃত্তি, ভ্রান্তি ও মিথ্যাব জগৎ থেকে সত্যে পদার্পণের রূপান্তরিত বিষম বোধের জ্ঞাপন।

।। ৩ ।।

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে রবার্ট ক্লাইভের কাছে বাংলাব নবাব সিরাজের পরাজয়ের সমকালীন ভারত ছিল বিভিন্ন দেশীয় রাজার শাসনাধিকারে আত্মিকভাবে পরস্পরবিচ্ছিন্ন। তারও একশো বছর পর সিপাহী বিদ্রোহের (১৮৫৭) সময়ে এই ভৌগোলিক অঞ্চলের কর্তৃত্বের বিন্যাস খুব একটা পরিবর্তিত হয়নি। একদিকে দক্ষিণভারতে ছিল হায়দ্রাবাদের নিজামের শাসন, অন্যদিকে উত্তর ভারত দিল্লির মোগল ও অযোধ্যার মুসলমান নবাব বংশের শাসনে, পশ্চিম ভারত শাসন করতো সিন্ধিয়া, গায়কোয়াড়, হোলকার প্রভৃতি সামন্ত অধিপতিরা। ইংরেজ বণিকের মানদন্ড তার অর্থনীতির স্বার্থেই শাসকের রাজদণ্ডে ক্রমোত্তীর্ণ হওয়ার পর্যায়ে দেশীয় রাজ্যগুলোকে দুর্বল এবং তাদের আঞ্চলিক সংহতিকে বিনষ্ট করে সমগ্র ভারত ভূখণ্ডে কেন্দ্রিয় কর্তৃত্ব স্থাপনের প্রয়াস শুরু করে। এরা আমদানি বাণিজ্য আর সেনা পরিযানের সুবিধার্থে উন্নততর গতিশীল রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রবর্তন করার ফলে তৎকালীন ভারতের শিক্ষিত এবং অগ্রগণ্য সম্প্রদায়ের একাংশ বিলাতী শিক্ষার গুণে জাতীয়তাবাদের পরিব্যাপ্ত চিন্তায় অভ্যস্ত হওয়ার প্রেরণা অনুভব করে। 'গোরা' উপন্যাসে দেখতে পাওয়া যায় সেই কালসন্ধির ভাবতবর্ষের কলকাতাকেন্দ্রিক উদীয়মান মধ্যবিত্ত সমাজের জীবনযাত্রার কল্প-প্রতিরূপ।

রবীন্দ্রনাথের মানস-বিকাশে যে সব অভিজ্ঞতা এবং চিন্তাসংঘর্ষ ছাপ ফেলেছিল তার শিল্পায়িত প্রতিচ্ছায়ায় 'গোরা'র চরিত্রদের ঘোরাফেরা। স্রষ্টার দেশাত্মবোধ এবং জাতীয় ভাবনার পরোক্ষ মুদ্রণ এতে সুনিশ্চিতভাবে ধাবণ কবেছে। উপন্যাসের সূচনায় যে দুই যুবকের জীবনযাপনের দৃশ্যকল্প উপস্থাপিত হয়েছে তাদের অন্যতম বিনয় তার স্বদেশ-চিন্তার প্রকাশ ঘটায় এই বাক্যের

মধ্যবর্তিতায় : "মেয়েরা প্রচ্ছন্ন থাকাতে আমাদের স্বদেশ আমাদের কাছে অর্ধসত্য হয়ে আছে — আমাদের হৃদয় পূর্ণপ্রেম এবং পূর্ণশক্তি দিতে পারছে না।" সমসময়ের থেকে বিনয়ের এই চিন্তা যে কতটা প্রাগ্রসর তা অনুভূত হয় তখনই যখন আমরা স্মরণ করি এই সত্য যে 'গোরা' উপন্যাসের পটভূমির সমসাময়িক কালে ভারত তথা কলকাতারও হিন্দু সমাজে মেয়েদের প্রকাশ্য বিচরণের বিষয়টা ছিল অসামাজিক। এই পটভূমিতে স্বভাবতই গোরা যখন তার ব্রাহ্মবিদ্বেষ এবং নারীবিদ্বেষ একাকার করে ফেলে, তখন তাকে কোন অস্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব বলে চিহ্নিত করা যায় না। গোরা বলে, " নারী অব্যক্ত, এই অব্যক্ত শক্তিকে কেবলই যদি ব্যক্ত করবার চেষ্টা করা হয়, তাহলে সমস্ত মূলধন খবচ করে ফেলে সমাজকে দ্রুতবেগে দেউলে করার দিকে নিয়ে যাওয়া হয়।" আত্ম প্রতিপন্ন গোরা যেন এক সমাজ-মুক্তিদাতা তপস্বী, যে তপস্যা দ্বারা দেশকে মুক্ত করার ব্রতে নিযুক্ত। তার তপস্যা অধ্যাত্ম-সাধনা নয়, মানব-মুক্তির সঞ্জীবনী : "পুরাতনের প্রলয় যজ্ঞের আগুনের শিখার উপরে নূতনের অপরূপ মূর্তি দেখবার জন্যই পুরুষের সাধনা।"

রবীন্দ্রনাথ যেন তাঁর এই মহৎ উপন্যাসের দুই পরস্পর-পরিপূরক পুরুষ চরিত্রের মাধ্যমে স্বীয় সমাজভাবনা এবং দেশভাবনার বিবর্তনের রূপরেখা এঁকেছেন। বিনয়ের জবানীতে দেশ এবং সমাজের প্রেক্ষাপটে মধ্যবিত্তের অবস্থান, তা শুধুমাত্র উপন্যাসের একটি চরিত্রের আত্মবিশ্লেষণই নয়, স্রষ্টারও সমাজ-বিশ্লেষণ। বিংশ পরিচ্ছেদে সুচরিতার প্রতি বিনয়ের উক্তি লক্ষণীয় : "দেশের জন্যে, সমাজের জন্যে, আমাদের কিছু আশা করবার নেই — চিরদিনই আমরা নাবালকের মত কাটাবো এবং ইংরেজ আমাদের অছি নিযুক্ত হয়ে থাকবে —... ইংরেজের প্রবল শক্তি এবং সমাজের জড়তার বিরুদ্ধে আমাদের কোথাও কোন উপায় মাত্র নেই। আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত লোকেরা এই কারণেই চাকরির উন্নতি ছাড়া আর কোন কথা ভাবে না, ধনী লোকেরা গবর্মেন্টের খেতাব পেলেই জীবন সার্থক বোধ করে ... সুদূর উদ্দেশ্যের কল্পনার কথাও আমাদের মাথায় আসে না।" গোরার বিশ্লেষণ আর পূর্বে উদ্ধৃত রবীন্দ্রনাথের ৮.১.১৯১০-এর 'স্কটিশ চার্চ কলেজ' এর বক্তৃতা একাকার হয়ে যায়, যখন শোনা যায়, "যতই দিন যাচ্ছে, চাকরির দরাদরি অঙ্গের ভূষণ হয়ে উঠছে এবং এখনকার ডেপুটির কাছে দেশের লোক ক্রমেই কুকুর বিড়াল হয়ে দাঁড়াচ্ছে।"

রবীন্দ্রজীবনের শৈশব-কৈশোর বিকাশপর্বে যতটা না ব্রাহ্ম আন্দোলন স্পর্শ করেছিল, তার চেয়ে বেশী তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন স্বাদেশিকতার দ্বারা। তাঁর ছ-সাত বছর বয়সেই নিজের পরিবারে দেখেছেন হিন্দুমেলার (প্রতিষ্ঠা ১২ এপ্রিল ১৮৬৭) সংগঠক ও পরিচালকদের; যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। এঁরা সকলে জাতীয় গৌরব সম্পাদনের জন্য জাতীয় ব্যায়াম, শিল্প, পুরাবৃত্ত, সাহিত্য, নাটক এমনকি পোশাক-পরিচ্ছদের মধ্য দিয়েও স্বদেশীয় আদর্শকে উজ্জ্বল করার জন্য মেতে উঠেছিলেন। ১৮৭৩ থেকে ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে (গোরার আখ্যানপটের বিস্তারও এই কালপর্বে) কবি আকণ্ঠ আগ্রহ নিয়ে জগতের সঙ্গে কোলাকুলিতে নিরত। দেশী-বিদেশী কাব্যপাঠ, বিদেশভ্রমণ ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিযে এই তারুণ্যের বিকাশ পূর্ণ-মানবিকতার অভিমুখে। 'বনফুল', 'ভানুসিংহের পদাবলী' ও 'বাল্মিকী

প্রতিভা'য় হৃদয় উচ্ছ্বাসের উত্তুঙ্গতা কবিকে জীবনের এক নতুন কক্ষপথে স্থাপন করেছিল।এই পথ ব্রাহ্মদের সমকালীন সংকীর্ণ দলাদলি থেকে অনেক দূরের। 'গোরা'য় সেই নব নব বৈচিত্র্য আস্বাদে উন্মুখ বিশ্বপথিক রবীন্দ্রনাথের ভারতভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে, যা শেষ পর্যন্ত তার নায়ককে সংকীর্ণ হিন্দু থেকে সংশোধিত 'ব্রাহ্ম' না করে আরও ব্যাপ্ত মানবতার অভিমুখে স্থাপন করে আর্ন্তজাতিক বোধে উদ্দীপ্ত করেছে।এই 'ইন্টারন্যাশনালিজম্' প্রাণিত মনুষ্যত্ব চরিত্রগুলির উপর বহিরারোপ না করে, তিনি তাদের জীবন-যাপন এবং আচার-আচরণের স্বতঃস্ফূর্ততায় এর উন্মেষ এবং বিকাশ দেখিয়েছেন বিভিন্নজনের ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে।গোরার ক্ষেত্রে তা মনুষ্যত্বের ভাব-উত্তরণে লক্ষণীয়; হিন্দুত্বের ভাবউন্মাদনা থেকে জীবন অভিজ্ঞতার হীরক-দ্যুতির উজ্জ্বলতায় যা প্রকাশিত।জীবনের প্রথম পর্যায়ে উগ্র হিন্দুত্ববোধ থেকেই সে বলেছিল, "ভারতবর্ষের নানা প্রকার প্রকাশে এবং বিচিত্র চেষ্টার মধ্যে আমি একটা গভীর ও বৃহৎ ঐক্য দেখতে পেয়েছি, সেই ঐক্যের আনন্দে আমি পাগল।সেই ঐক্যের আনন্দেই ভারতবর্ষের মধ্যে যারা মূঢ়তম, তাদের সঙ্গে একদলে মিশে ধূলোর গিয়ে বসতে আমার মনে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ হয় না"।এই গোঁড়া হিন্দু গোরাই আবার যখন পরিজ্ঞাত হয় যে, আজীবন সে বৃথাই হিন্দুত্বের উপাসনা করে এসেছে, হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত হবার জন্মাধিকারের অধিক্ষেত্র থেকে সে বঞ্চিত; কেননা জন্মসূত্রে সে আইরিশ।সে পরিজ্ঞাপিত হয় শৈশবে অনাথ হয়ে গিয়ে সে হিন্দু ঘরে প্রতিপালিত হয়েছে।এই আত্মঅভিজ্ঞানের নব-পরিচয়ের পরিজ্ঞানঋদ্ধ গোরার উচ্ছ্বাসময় উক্তির মধ্যে ভারতচেতনার সুষম প্রকাশ : " আজ আমি এমন শুচি হয়ে উঠেছি যে, চন্ডালের ঘরেও আমার আর অপবিত্রতার ভয় রইল না। পরেশবাবু আজ প্রাতঃকালে সম্পূর্ণ অনাবৃত চিত্তখানি নিয়ে একেবারে আমি ভারতবর্ষের কোলের উপরে ভূমিষ্ঠ হয়েছি — মাতৃক্রোড় যে কাকে বলে, এতদিন পরে তা আমি পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছি"।

।। ৩ ।।

'গোরা' র হিন্দু জাতীযতায় যেমন সমকালের কলকাতা-ভিত্তিক এলিট বাঙালির জীবন, যাপন ও স্বপ্নের বাস্তবকল্প চিত্র ধরা আছে, তেমনই এটাও ঠিক যে রবীন্দ্রনাথ এর অসারত্বটাও দেখিয়ে দিয়েছেন জাতীয় জীবনের আর একটা ভিন্নমাত্রার রাজনৈতিক হতাশা, প্রতিশোধস্পৃহ সংকীর্ণতার অনুশীলন পর্বের মধ্যে বসে।রচনা বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী উগ্র স্বদেশী সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের কালে, ব্যাখ্যা ফেলে আসা ধর্মবিরোধের আর এক সংকীর্ণতা-পর্বের। খুব সঙ্গত কথা বলেছেন সমালোচক, "এই গোরার কোনোকিছুর সঙ্গেই এখন আর আমাদের মোটা দাগের কোনো যোগসূত্র নেই। হিন্দু ব্রাহ্ম সমাজের ব্যাপারটা এখন সমাজদেহ থেকে একেবারে বাস্পের মতো উপে গেছে। দ্বন্দ্বের কোথাও কোনো অস্তিত্ব নেই।... তবু তো গোরা পড়তে গেলে একথা কখনো মনে হয় না যে রবীন্দ্রনাথ একটি মৃত বিষয় নিয়ে অনাবশ্যক কালক্ষেপ করেছেন, ...।"[১] তবুও কেন ফিরতে হয় শতবর্ষ পার করে দেওয়া এই উপন্যাসের দিকে ? যে সমস্যা অবলুপ্তির পথে, যাব তাপ-উত্তাপ জনসাধারণের মন থেকে অপসৃয়মান, তেমন মরা-সমস্যা সম্পর্কে নিরাপদ গরমাগরম কথা বলে প্রগতি ও বিপ্লবী ভাবমূর্তিতে বার্নিশ করার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অপক্ষপাত সুবিদিত। 'কৌলীন্য

প্রথা' তাই তাঁর লেখার কেন্দ্রে স্থান পায়নি, বরং বলেছেন, "... কৌলীন্য নেই, একজনের একশটা বিয়ে নেই, plot-এর ত ভাবনা নেই — তবে আর এটাকে ঘেঁটে কি হবে ?" ব্রাহ্ম-হিন্দু বিরোধ মুখ্য বিষয় হলেও 'গোরা'র শাশ্বত মূল্য থেকে যাবার কারণ, "এখানে মানুষের সমাজ এবং মানুষের প্রশ্ন আছে, মানুষের বৃত্তিগুলি কাজ করছে, যে নরনারী এই উপন্যাসে দেখা দিচ্ছে তাদের 'ওরা আমরা নই, আমরা ভিন্নতর জীব' বলে অগ্রাহ্য করা যাচ্ছে না। সমস্ত গতি ও পরিবর্তনশীলতার মধ্যে গোরার মানুষের সঙ্গে গভীর, এমনকি অচ্ছেদ্য সম্পর্কও আমবা অনুভব করছি। ওরা কোথায় কোথায় কেন আটকা পড়েছিল, কোথায় পড়েছিল তাদের হাতে-পায়ে বেড়ি, কীভাবে চেতনা ঘুলিয়ে উঠেছিল বোঝা সহজ হয়ে যাচ্ছে আমাদের পক্ষে। এতে সমাজের অগ্র বা পশচাৎ যাত্রাব কিছু কিছু সাধারণ নিয়মও আমাদের বোধগম্য হচ্ছে... ।... ঔপন্যাসিককে কোনো-না-কোনো একটি জগৎ তৈরি করে নিতে হয়। ..... রবীন্দ্রনাথ গোরায় যা পেরেছেন, ..সমসাময়িকতা উজিয়ে-উপচে সেই জগৎ লাভ করেছে এক আপেক্ষিক চিরন্তনতা, অনেক পথ পেরিয়ে চলে এসেছে ধোঁয়া-বিষে আক্রান্ত বর্তমানেও। ... রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাহিনীর মধ্যে দিয়ে গোরার প্রশ্ন, গোরার সঙ্কটের ছবিই দেবার চেষ্টা করেছেন। উপন্যাসের নিজস্ব গতি অনুসরণ করে নয়, তাঁর নিজের ধরনে একাজ তিনি করেছেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গোরার অনুসন্ধান ও তার শেষ ফল রবীন্দ্রনাথেরও।... গোরা উপন্যাসে পাই সেই বিশাল দূরভেদী দৃষ্টি, যা শুধুই বেশিদূর পর্যন্ত দেখে না, যা মানুষের জন্যে শুধুই ইতিবাচক নয়, বরং সেই দৃষ্টি মানুষ, জীবনের প্রধান প্রধান বিঘ্নগুলিকেও রঞ্জরশ্মির মতো অতিক্রম করে যায়। ... তিনি তাঁর নিজের মতোই সৃষ্টি করে নেন মানব জগৎ। গোরার জগৎও তাই। সেখানে মাকড়শার জালের মতো তৈরি হয়ে যাচ্ছে প্রায় অদৃশ্য সূক্ষ্ম ফাঁদ, আটকে যাচ্ছে বিনয়, আটকা পড়ছে গোরার মতো শক্ত-হাড়ের মজবুত মানুষও। গোরার মানুষদের কামনা-বাসনা-আকাঙ্ক্ষা পাতায় পাতায় তুলে ধরেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর সমস্ত অন্বেষা, তাঁর স্বদেশ সন্ধান, তাঁরই সৃষ্ট মানব জগতের নাট্যলীলা স্তরে স্তরেই তিনি স্পষ্ট করে তোলার চেষ্টা করেছেন। এইজন্যই গোরা উপন্যাস। এখানেই রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বিস্ময়কর কাজ করেছে" ।[২]

।। ৪ ।।

'গোরা' উপন্যাসকে গদ্য-মহাকাব্য বলার একটা ধারা চলে আসছে অনেকদিন থেকে। এর প্রবক্তারা বলতে চান, উপন্যাসে বিধৃত হিন্দু এবং ব্রাহ্মের মত-সঙ্ঘাতেব মধ্যে রয়েছে মহাকাব্যের বিস্তার। 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যায় জানান : "যাহার রচনার ভিতর দিয়া একটি সমগ্র দেশ, একটি সমগ্র যুগ আপনার হৃদয়কে, আপনাব অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করিয়া তাহাকে মানবের চিরন্তন সামগ্রী করিয়া তোলে" তা-ই মহাকাব্য। 'গোরা' কে যাঁরা মহাকাব্য বলতে চান, তাঁরা এর গদ্যবিস্তারের মধ্যেই প্রাচীন গ্রীস ও ভারতের চার জন-মহাকাব্যসুলভ ('ইলিয়াড', 'ওডিসি', 'মহাভারত' ও 'রামায়ণ') বৈশিষ্ট্য-ধারকতাকেই চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন, " 'গোরা' মহাকাব্যের প্রসার ও গভীরতা লইয়া বাংলা সাহিত্যের প্রথম

এবং আজ পর্যন্ত একমাত্র আধুনিক উপন্যাস।"[৩] শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বাংলা উপন্যাস-সমালোচনার প্রাচীন মহাকাব্য-সুলভ বিস্মৃত কিন্তু বিশ্রুত গ্রন্থটিতে লিখেছিলেন, "'গোরা' রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসাবলীর মধ্যে একটি বিশিষ্ট ও অনন্যসাধারণ স্থান অধিকার করে। ইহার প্রসার ও পবিধি সাধারণ উপন্যাস অপেক্ষা অনেক বেশি। ইহাব মধ্যে অনেকটা মহাকাব্যের বিশালতাও বিস্তৃত আছে। ... ইহার পাত্র-পাত্রীগণের যে কেবল ব্যক্তিগত জীবন আছে তাহা নহে, আন্দোলন-বিশেষ বা ধর্মগত সংঘর্ষ-বিশেষের প্রতিনিধি হিসাবে তাহাদের একটি বৃহত্তর সত্তা আছে। বঙ্গদেশের একটা বিশিষ্ট যুগসন্ধিক্ষণের সমস্ত বিক্ষোভ-আলোড়ন, আমাদের দেশাত্মবোধের প্রথম স্ফুরণের সমস্ত চাঞ্চল্য, আমাদেব ধর্মবিপ্লবের সমস্ত একাগ্রতা ও উদ্দীপনা এই উপন্যাসে স্থান লাভ করিয়াছে। উপন্যাসের চরিত্রগুলির মুখ দিয়া ধর্মবিষয়ে সনাতনপন্থী ও নব্যপন্থী, রক্ষণশীল ও সংস্কারক— এই উভয় সম্প্রদায়ের যুক্তিতর্ক ও আধ্যাত্মিক অনুভূতির সমস্ত ক্ষেত্রে নিঃশেষ ভাবে অধিকৃত হইয়াছে। গোরা, বিনয়, পরেশবাবু, হারান, সুচরিতা, ললিতা, আনন্দময়ী সকলেরই প্রধান আগ্রহ একটা মতবাদ প্রতিষ্ঠায়, ধর্ম ও ব্যবহৃত জীবনে একটা বিশেষ পথ বা চিন্তাধারার সমর্থনে।"[৪] এই মহাকাব্য প্রতিপাদন সূত্রায়িত করে সমালোচক লেখেন, "'গোরা'র কাহিনী সুদীর্ঘব্যাপ্ত নয়, ঘটনা-প্রবাহের বিপুলত্বও এখানে উল্লেখ্য নয়। তা সত্ত্বেও উপন্যাসরূপে 'গোরা'র মহাকাব্যিক ব্যাপ্তি ও গভীরতা অন্য সাধারণ উপন্যাসের সঙ্গে তুলনা করলেই বোঝা যায়। এই উপন্যাসের স্থান ও কালগত পটভূমি, বিষয়বস্তুর বিস্তৃতি, তত্ত্বগত ভিত্তি, চরিত্র সমূহের আদর্শ সন্ধানী অন্তঃপ্রেরণা, উত্থাপিত সমস্যার সামগ্রিক সমাধান, ব্যক্তিগত ও জাতিগত জীবনের সুষম মীমাংসা হয়েছে সরল-গতিশীল-সুঠাম ভাষারীতির প্রয়োগে। আর এই সব কিছু মিলে 'গোরা'কে অসাধারণত্বগুণে মণ্ডিত করেছে— দিয়েছে এপিক উপন্যাসের মহিমা।"[৫] বুদ্ধদেব বসুও 'গোরা'র মধ্যে 'বিশেষ একটি যুগের সম্পূর্ণ মর্মকথা'র প্রকাশ লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু কেবলমাত্র কলকাতার অভিজাত হিন্দু আর ব্রাহ্মের দ্বন্দ্বের বিস্তারের মধ্যে মহাকাব্যের মহনীয়তা (grandeur) লক্ষ্য করা কল্পনাতিরেক হিসেবেই গণ্য হবে। কেননা ব্রাহ্ম-হিন্দু বিরোধেব মূল যে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের সম্প্রসারণমাত্র এটা সংশ্লিষ্ট সময়ের ইতিহাস সম্পর্কে সামান্য অবহিত পাঠকমাত্রেই জানেন। আদিতে ব্রাহ্মরাও ছিল ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণ্যবাদী। ১৮৬১'র ১ জুলাই কায়স্থ কেশবচন্দ্রের যোগদান, ১৮৬২'র ১৩ এপ্রিল নিজের স্ত্রীর সঙ্গে কেশবের প্রকাশ্য রাজপথে হাঁটা, ২৯ আগস্ট ব্রাহ্মণ-কায়স্থ অসবর্ণ বিবাহদান, শিক্ষিতা ব্রাহ্ম নারীদের জন্য কেশবের উদ্যোগে 'ব্রাহ্মিকা সমাজ' প্রতিষ্ঠা, ১৮৬৬'র ফেব্রুয়ারিতে মাঘোৎসবে পুরুষ ও মহিলার (চিকের আড়ালে) সহাবস্থানের ব্যবস্থা ইত্যাদি উদারীকরণ কায়স্থ-কেশব ও তাঁর দলবল সম্পর্কে দেবেন্দ্রনাথ অনুগামী 'কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ'-এর প্রাচীনপন্থীদের এতটাই বিরক্ত করছিল যে দুটো পথ তৈরি হতে বিলম্ব হয়নি। একদিকে ১৮৬৪ সাল থেকে কেশবচন্দ্রের অনুগামীদের অতিপ্রগতির অনুকূল নতুন নতুন আত্মঘোষণা, প্রচার ও আচরণ; অন্যদিকে দেবেন্দ্রনাথের সমন্বয়-প্রয়াসী নীরবতার মাঝে রক্ষণশীলরা বিব্রত হতে লাগলেন উত্তরোত্তর। ১৮৬৪ সালে কেশবপন্থী নবীন ব্রাহ্মরা বললেন, 'উপবীতধারী ব্রাহ্মণ বেদীতে বসলে তাঁরা উপাসনায় যোগ দিতে পারবেন না'। ৫ অক্টোবর ১৮৬৪ ঘূর্ণিঝড়ে 'কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে'র বাড়ি ভেঙে যাওয়ায়

সাময়িকভাবে উপাসনা দেবেন্দ্রনাথের বাড়িতে স্থানান্তরণের সিদ্ধান্ত হয়। কেশবকুলের কায়স্থ ব্রাহ্মরা উপাসনার জন্য ঠাকুরবাড়ি গিড়ে দেখেন 'উপবীতধারী ব্রাহ্মরা আগেই গিয়ে উপস্থিত ও উপাসনা শুরু করে দিয়েছেন'। এখান থেকেই গৃহবিচ্ছেদ। ১১ নভেম্বর ১৮৬৬ কেশবের 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' এর জন্ম। তাঁর প্রগতি ও আধুনিকতার জুড়িগাড়ি অব্যাহত গতিতে চলেছে ১৮৭৮ পর্যন্ত, যতদিন না তিনি ত্রয়োদশী কন্যা সুনীতি'র সঙ্গে সুপাত্র কোচবিহারের যুবরাজের বিয়ের ব্যবস্থা করেন। এই বিয়ে হয় ৬ মার্চ ১৮৭৮। অথচ এর আগে কেশবই ব্রাহ্মসমাজে নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন যে অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যার বিবাহ দেওয়া যাবে না। দ্বিচারিতায় ক্ষিপ্ত কেশব অনুগামী শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র দত্ত ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীরা ১৫'মে ১৮৭৮ প্রতিষ্ঠা করলেন 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ'। নবত্বের প্রতিযোগিতায় তবু পিছু হটতে অরাজি কেশবচন্দ্র ২৬ জানুয়ারি ১৮৮০ ঘোষণা করলেন 'নববিধান' নামে চতুর্থ ব্রাহ্মসমাজ। ১৮৭৯'র ২২ জানুয়ারি তাঁর 'Am i an inspired prophet' ও ১৮৮০'র ১৬ জুন, প্রকাশিত 'An epistle to fellow Indians' শীর্ষক প্রবন্ধে কেশবচন্দ্র তাঁর প্রগতিভাবনা ও বিজ্ঞানমনস্কতার ঝড় বইয়ে দেন। লেখেন, ''Ye shall respect science above all things, the science of matter above the Vedas, and the science of mind above the Bible. Astronomy and geology, anatomy and physiology, botany and chemistry are the living scriptures of nature's God. Philosophy, logic and ethics, yoga, inspiration and prayer are scriptures of the soul's God. In the new faith everything is scientific.'' ১৮৮১ সালেই কেশবচন্দ্রের অনুপ্রেরণায় নববিধান ব্রাহ্মসমাজের ভাই গিরিশচন্দ্র সেন কোরান শরীফের বঙ্গানুবাদে করেন।

তবে মনে রাখতে হবে মুখরক্ষার অনুকূল সংস্কারের সক্রিয়তা দেখালেও কোন ব্রাহ্মসমাজেই আমূল মানবতাবাদী ভাবনার ঔদার্য ছিল না। ১৮৬৭ সাল থেকেই কেশবের নিজের বাড়িতে খোল-করতাল সহযোগে সংকীর্তন, ১৮৬৮ সালে নগর-সংকীর্তনে বেরনো, ১৮৮৩'র ২৫ জানুয়ারি নিজের বাড়িতে শ্রী রামকৃষ্ণকে নাটক দেখতে ডেকে 'নববৃন্দাবন' নামক নাটকাভিনয়ে আধ্যাত্মিক ভেলকি দেখানো ইত্যাদি মধ্যবর্তিতায় এই কেশবচন্দ্রই হিন্দু পৌত্তলিকতার খপ্পরে ঝাঁপ দেন। যার প্রমাণ তাঁর শিব ও কৃষ্ণের ভূমিকায় অভিনয়, চৈতন্য-নিত্যানন্দ অনুসারী 'নবনৃত্য' প্রবর্তন। সঙ্গতভাবেই গবেষক প্রশ্ন তুলেছেন : "ব্রাহ্মরা কি প্রকৃতই প্রগতির সমর্থক ছিল? জাতিভেদ অপসারণ কি তাঁরা চাইতেন এবং সত্যিই কি নিজেদের সঙ্গে নিগৃহীত নীচু সোপানের মানুষদের সম-অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইতেন? দেবেন্দ্রনাথের 'আদি সমাজ' এবং কেশবচন্দ্রের 'নববিধান'— কেউই তা চাননি। *উপনিষদ ও বেদান্তের দোহাই দিয়ে তাঁরা একটি অন্তর্কলহমূলক নিজেদের মতো এক একটি ইষ্ট-গোষ্ঠীই তৈরী করে নিয়েছিলেন!*[৬] আর হিন্দুসমাজ তো তখন যথেষ্টই গোঁড়া, জীর্ণ লোকাচার তাকে বাংলার নিঃস্রোতা খানাডোবায় কেমন বঙ্গীয় রূপ দিয়েছে তা 'প্রচার' পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'হিন্দুধর্ম' প্রবন্ধের ভাষ্য থেকেই বোঝা যায় :

"হিন্দুয়ানিতে অনেকরকম দেখিতে পাই। হিন্দু হাঁচি পড়িলে পা বাড়ায় না, টিকটিকি ডাকিলে 'সত্য সত্য' বলে, হাই তুলিলে তুড়ি দেয়, এ সকল কি হিন্দুধর্ম? অমুক শিয়রে শুইতে নাই, অমুক আস্যে খাইতে নাই, শূন্য কলসী দেখিলে যাত্রা কবিতে নাই, এ সকল কি হিন্দুধর্ম?... যদি ইহাই হিন্দুধর্ম হয়, তবে আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে আমরা হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন চাহি না।" তাহলে এই হিন্দু আর ব্রাহ্মধর্মের দ্বান্দ্বিক জীবনভাষ্য বলে যে, 'গোরা' কে চিহ্নায়িত কবা হয়, তাতে সাধারণ মানুষের জীবনযাপন কতদূর প্রতিফলিত? এই কালের ভারত রাজধানী কলকাতাতেই তো চিরন্তন ম্যালেরিয়া, কলেরা, কালাজ্বব, টাইফয়েড ও বসন্তে বছব বছব হাজার হাজার মানুষ উজাড হয়েছে, কুলীনের স্ত্রী খোবপোষের মামলা জিতে গরীব ব্রাহ্মণকে হাজতবাস করিয়েছে যেমন, তেমনি ১৮৭১-এ হুগলিতে তেত্রিশজন কুলীন ২, ১৫১ ব্রাহ্মণকন্যার পাণিপীডন করে গেছে, 'হরিদাসের গুপ্তকথা'য় (১৮৭১) শহর তো বটেই মফস্বলও ছেয়ে গেছে, থিয়েটার একইসঙ্গে জনপ্রিয় ও দলাদলির মাধ্যম হয়ে উঠেছে, রঙ্গমঞ্চে বেশ্যাদের অভিনয়ের অধিকার নিয়ে সমাজ তোলপাড় হয়েছে, সমস্ত নিষেধাজ্ঞা ও বিরোধীপ্রচার অগ্রাহ্য করে অশ্লীল কাঁসারীপাড়ার সঙ হাজার হাজার মানুষেব হর্ষ, বিস্ময়, বিকৃত উল্লাসে নন্দিত হয়ে নগর-পরিক্রমা কবেছে, ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবে হাজার হাজার মানুষ মরেছে (১৮৭৪), ১৮৭৪-এ বাংলাসহ গোটা দেশ দুর্ভিক্ষগ্রস্ত হয়েছে, মধ্যবিত্ত শিক্ষিতদের 'Indian League' তৈরি (১৮৭৫) হয়েছে, প্রিন্স অব্ ওয়েলস-এর সফর ঘিরে দলাদলি ও দুয়ো দেওয়ার প্রতিযোগিতা চলেছে (১৮৭৬), নাট্য নিয়ন্ত্রণে আইন জারি করে মঞ্চে ব্যঙ্গের খোঁচা বন্ধ করে ভক্তিবন্যার খাল কেটেছে সরকার মারাঠা খালেব অদূরে শোভাবাজার, শ্যামবাজার হাতিবাগানে, মুসলমানরা আত্মরক্ষা আর আত্মঘোষণা দুইয়ের স্বার্থে সংগঠিত হতে তৈরি করেছে 'ন্যাশনাল মুহম্মাডান অ্যাসোসিয়েশান', সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ প্রয়াসী 'Vernacular Press Act' এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভায় পাঁচ হাজার লোক জড়ো হয়েছে, উইলসনেব সার্কাস দেখার জন্য জনমনে উন্মাদনা তৈরি হয়েছে। গণজীবনের এইসব চঞ্চলতার ছাপছোপ ছাড়াই গোরার তত্ত্বভাবুক তর্ক আর কলকাতার রাস্তায় হনহন হেঁটে এবাড়ি-ওবাড়ি গতায়াতের চিত্র দিয়ে বহতা সময়-সমাজের পূর্ণাঙ্গ মহাকাব্যিক 'grandeur' রচনা সম্ভব? রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য তো তেমন ছিল না। কলকাতার তৎকালের মহাকাব্য লিখতে হলে যে সব গহন-গভীর অভিজ্ঞতার স্পর্শসিঞ্চন অপরিহার্য তার অনেককিছুই রবীন্দ্রনাথের অর্জিত ছিল না 'ও পাড়ার প্রাঙ্গনের ধারে' যাওয়ার অক্ষমতায় — একথা স্বীকার করতে আপত্তি কিসের ? 'উপন্যাস' মাধ্যমে গদ্যমহাকাব্য না হোক, 'গোরা' এক মহৎ সমাজ-ইতিহাস ধারক উপন্যাস। পৃথিবী সৃষ্টির পব আরও অনেক মানব-মহাকাব্যেরও কি কালচিহ্ন বিলুপি আব নিবিড় সমাজ-নিবীক্ষাব অক্ষমতায় সৃষ্টি-দুয়ার ভেদ করা ব্যর্থ হয়নি ?

।। ৫ ।।

১৮৫৩-৫৪ সালে ব্রিটিশ কোম্পানী রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রবর্তন করার ফলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষিত এবং অগ্রগণ্য সমাজের একাংশ বিলাতী শিক্ষার গুণে জাতীয়তাবাদের

পরিব্যাপ্ত চেতনায় অভ্যস্ত হবার প্রেবণা অনুভব করে। পরবর্তী তিন-চার দশকে কলকাতা বিদেশী নব-শাসকের প্রধান শাসনকেন্দ্র থাকায় এখানের সমাজজীবনেব চঞ্চলতা সমস্ত দেশকেই কিছু না কিছু প্রভাবিত কবে। নানা প্রদেশ থেকে বিত্ত পুঞ্জীভবনের জন্য বানিয়া ব্যবসায়ীরা যেমন এখানে এসে জোটে, তেমনই চিত্তচাঞ্চল্যকে প্রদেশের অন্যত্র এবং দেশের নানাস্থানে প্রসাবিত করাব বাসনা লক্ষ্য করা যায় এখানকার ধর্মধ্বজীদের মধ্যে। 'গোরা' উপন্যাস এই কালসন্ধিক্ষণের ভারতেব কলকাতাকেন্দ্রিক উদীযমান বাঙালি হিন্দু ও তা থেকে উদ্ভিন্ন ব্রাহ্ম সমাজেব জীবনযাত্রা আশ্রয়ে পল্লবিত হয়েছে। তাই এর আখ্যান-বাচনে নিশ্চিতভাবে স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধ ও জাতীয় ভাবনাব পরোক্ষ মুদ্রণ বিন্যস্ত আছে। ভারতবর্ষের স্বরূপ কোন ধর্মের আধারে ধারণ কবার চেষ্টা কোন যুগেই সফল হবে না — এই সমাজ-রাষ্ট্রিক সত্য-দর্শনকে উপন্যাসে প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁব উপন্যাসের প্রেক্ষিত কালের কলকাতায় সমাজেব প্রকটিত স্তরে সক্রিয়তায় সচল একদিকে হিন্দু ও অন্যদিকে কযেক-দশক আগে হিন্দু ব্রাহ্মণ্য একেশ্বরী নিরাকাব উপনিষদ-চিন্তা থেকে উদ্ভূত ব্রাহ্ম মতাবলম্বীরা। ইসলাম উপেক্ষিত, প্রান্তিক গ্রামাঞ্চলে তার নিষ্পেষিত কিন্তু প্রতিবাদী ও প্রতিরোধী অস্তিত্ব (চরঘোষপুর পর্বে) নিবন্ধিত। হিন্দুর পদতলপিষ্ট গরিষ্ঠ মানবগোষ্ঠী তখনও আত্মজ্ঞান-হীনতায় মূক, আত্মাবমাননাকেই জীবনের নির্ধারিত প্রাপ্তি হিসেবে গ্রহণ কবে আত্মপ্রকাশে অক্ষম। অভিজ্ঞতা এবং ভূয়োদশী প্রজ্ঞা থেকে রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন যে, কালান্তরের ভারতে এই সঙ্কীর্ণ ধর্মদ্বন্দ্ব অসার প্রতিপন্ন হবে। তাই একদা ব্রাহ্মধর্ম-বিদ্বেষী গোরা হিন্দুত্বের খাতে শক্ত মাটির তাত্ত্বিক ভিত্তি পেযেছে ভেবে আত্মতুষ্টি অনুভব কবলেও, অন্তিমে লেখক দেখান, অজ্ঞাত ক্ষযে সেই পাড়ও ভেঙে পড়েছে।

বিশালব্যাপ্ত উপন্যাসের ছিয়াত্তরটি পরিচ্ছেদের বিস্তারে গোরা ১৮৭৮-৮২'র কলকাতার হিন্দু সুবিধাভোগী অগ্রাধিকার পাওযা পরিবারেব সব বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্য দিয়েই জীবনতবী ভাসায়। কিন্তু তার জীবন, প্রেম, মনুষ্যত্ব, ধর্ম ও নারী সম্পর্কিত সব ধাবণাই প্রায় অলীক প্রতিপন্ন হয় অভিজ্ঞতা আর পরিস্থিতির ঘাত-প্রতিঘাতে। তার আচরণিক হিন্দুত্বের শিকড়ও উৎপাটিত হয় জন্মপরিচয়ের অ-হিন্দু, অ-ভারতীয় রক্ত উৎস উদ্ঘাটিত হবার জ্ঞাপনে। হিন্দুত্বেব সংকীর্ণতা, সেই সংকীর্ণতার প্ররোচনায় ব্রাহ্ম-বিদ্বেষ, ব্রাহ্ম-বিদ্বেষের সমান্তরালে আধুনিকা ও শিক্ষিতা অকুণ্ঠ ব্রাহ্ম যুবতীব প্রতি বিদ্বেষ — প্রভৃতি ভ্রান্তিকে অভিজ্ঞতার মধ্য দিযে অতিক্রম করিযে ববীন্দ্রনাথ তাঁর এই উপন্যাসের নায়ককে যেখানে উত্তীর্ণ করেছেন, সেই অবস্থায় তার কাছে অখণ্ড ভারতবোধ এবং সার্বিক মানবকল্যাণই অবিকল্প বিবেচ্য হয়ে ওঠে। এই মানবতায উত্তরণ কোন সঙ্কীর্ণ জাতি-ধর্ম-সমাজ ও বিধানের দ্বারা পরিচালিত না হওয়ার শক্তিতে বলীয়ান। জীবনের পর্বসন্ধিতে উপনীত গোরার আত্ম-আবিষ্কার তাকে ভ্রান্তি ও মিথ্যাব জগৎ থেকে সত্যে পদার্পণ কবায। জীবন সম্পর্কে নতুন উপলব্ধির অনুপ্রাণনায সে উচ্চাবণ কবে : "আমি যা দিনরাত্রি হতে চাচ্ছিলুম অথচ হতে পারছিলুম না, আজ আমি তাই হয়েছি। আমি আজ ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, খৃস্টান কোন সমাজের কোন বিরোধ নেই, আজ এই ভারতবর্ষেব সকলের জাতই আমার জাত,

সকলের অন্নই আমার অন্ন।" অথচ উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এই গোরাই ছিল গোঁড়া হিন্দু : "কলেজে পাস করা যখন একটাও বাকি রহিল না তখন এই ছাদের উপর মাসে একবার করিয়া যে হিন্দুহিতৈষী সভায় অধিবেশন হইয়া আসিয়াছে এই দুই বন্ধুর (গোরা ও বিনয়) মধ্যে একজন তাহার সভাপতি আর একজন তাহার সেক্রেটারি।" এই হিন্দু জাতীয়তার অলীক আস্ফালন, ব্রাহ্ম ভাবধারার কপট আধুনিকতা সমকালের বাস্তব ইতিহাসের খণ্ডচিত্রকে তুলে ধরে। উপন্যাসটি এই কারণেই বাঙালির আত্ম-আবিষ্কারের প্রয়াসপর্বের প্রথম পর্যায়কে বোঝার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসাবে আরও দু-এক শতাব্দী গুরুত্ব আদায় করবে নিঃসন্দেহে।

## ।। উল্লেখপঞ্জি ।।


১।  "রবীন্দ্র-উপন্যাসে স্বদেশ ভাবনা . গোরা," হাসান আজিজুল হক, 'কথাসাহিত্যের কথকতা,' 'একুশে' ১৩/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩, ১৯৮৯, পৃ: ৬৪

২।  হাসান আজিজুল হক, তত্রৈব, পৃ. ৬৫-৬৯

৩।  'ববীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা', নিউ এজ পাবলিশার্স, ১৯৬২

৪।  'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসেব ধারা', 'মডার্ণ বুক এজেন্সী', পৃ: ১৮৯

৫।  কেকা ঘটক, "গোবা : মহাকাব্যিক উপন্যাস", 'কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয বাংলা সাহিত্য পত্রিকা', ১৯৯২-৯৩, পৃ ৬২

৬।  সোমক দাস, 'ব্রাহ্মসমাজ ও শ্রীবামকৃষ্ণ', 'মহাজাতি প্রকাশন' ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩, ১৯৯১, পৃ. ৪১


---

প্রবন্ধটি ক্ষুদ্রাকাবে প্রথম মুদ্রিত হয ৮ ফেব্রুয়াবি ২০০৯, বিশেষজ্ঞের নির্দেশে বর্তমান সংকলনে বিস্তৃত করা হ'ল।

# চতুরঙ্গ : প্রবৃত্তির ঝঞ্ঝাধ্বস্ত শহুরে হিন্দু বাঙালির জীবন মন্থনের রলরোল

অভিভূত নিশ্চেতনা দিয়ে সাহিত্যপাঠ আমাদের কালের দস্তুব হয়ে উঠেছে। এতে পাঠকেব মধ্যে কতজন উপলব্ধির সীমানা-কপাট পেরিয়ে বিষয়জ্ঞানের ভাঁড়াব ঘরের দিকে যেতে পারলো তার কোন সংখ্যাতত্ত্ব না থাকায় এখনো কোন অসুবিধা হচ্ছে না। কিন্তু সঞ্চার ক্ষমতায় খর্বতা, শক্তিহীনতা ও মানসিক দৈন্যসম্বল ব্যাখ্যাকাররা যে অলজ্জিত আত্মপ্রকাশে একালে আর কুণ্ঠিত নয়; তা বাংলা সাহিত্য-সমালোচনায় 'বামা' মার্কা বই হাতে পড়লেই বোঝা যায়। এই শিবের গীত দিয়েই সূচনা করতে হ'ল প্রায় শতবর্ষের কাছাকাছি চলে আসা 'চতুরঙ্গ' উপন্যাস বিষয়ে কিছু কথা বলার ইচ্ছা। উপন্যাসটি নাকি 'সামাজিক' নয, মনস্তাত্ত্বিক। এই অনুসিদ্ধান্ত চালানো হচ্ছে কাহিনীর প্রেক্ষাপট থেকে প্রায় একশো পনের বছরের দূবত্বে দাঁড়িয়ে! অথচ আখ্যানের পট এবং বিধৃত মানুষ ক'জন সর্বকালীন নয়, এমনকি যখন লেখা হচ্ছে এ কাহিনী (বাংলা বছরের ১৩২১ এর অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন 'সবুজপত্র' পত্রিকায়) তখনকার কালেব নিরিখেও চতুরঙ্গের চরিত্রবা আক্ষরিক অর্থেই 'ব্যাকডেটেড', কেননা কলকাতার একই জনপদে হিন্দু জনতার জীবনধারা তখন অন্য খাতে বয়ে চলেছে।

১৮৯৮ সালের মার্চ-এপ্রিলের প্লেগধ্বস্ত কলকাতা 'চতুবঙ্গ' উপন্যাসের প্রেক্ষণস্থল। এব এক বছর মাস তিন চাব আগে স্বামী বিবেকানন্দ সুদীর্ঘ বিদেশভ্রমণ শেষ কবে ভারতে ফিরে এসেছেন (১৫ জানুয়ারি ১৮৯৭, কলম্বো)। এক বছর দু-সপ্তাহ পর মহাজন পথ অনুসরণে ভগিনী নিবেদিতাও (তখন নাম : মিস মার্গারেট নোবেল) এসে গেছেন। বিবেকানন্দ তাঁকে দীক্ষাদান ক'বে (২৫ মার্চ ১৮৯৮) শিষ্য স্বরূপানন্দের হাতে অর্পণ করেছেন শিক্ষাদানের ভার। শরীর ক্রমশঃ অসুস্থ হযে পড়ছিল; তাই চৈত্রমাসে দার্জিলিং যান স্বাস্থ্যোদ্ধারে। এই সময়ে কলকাতায় প্লেগ-রোগের প্রাণঘাতী বিষ নিঃশ্বাসের মহাপ্রকোপ বিস্তৃত হয়। কলকাতা ফিরে এসে আর্ত-বিপন্ন ও পীড়িতদের সাহায্যের ব্যবস্থা করে এই রোগের প্রকোপ কমলে বিবেকানন্দ সশিষ্য নৈনিতালে গমন করেন। এব পূর্ববর্তী বছরটা আবার দুর্ভিক্ষের দ্বারাও চিহ্নিত। The year 1897 was particularly unfortunate as it brought both famine and bubonic plague in its train "[১] সুদীর্ঘকাল বাহিত দারিদ্র্যরোগ, তার সহোদর পর্যাবৃত্ত (periodic) দুর্ভিক্ষর সঙ্গে এই বছর যুক্ত হল আর এক দুর্দশা সঞ্চারক মহামারী প্লেগ। তৎকালীন ভারতের প্রধান শহরগুলোর জনচিত্ত 'Brahmanic orthodox'[২] দ্বারা পরিচালিত। প্লেগরোগের প্রকোপ প্রতিরোধে সরকাবী অনুসন্ধানে নিযুক্ত বিদেশী

কর্মচারী বা অফিসাররা লোকের বাড়ি এবং মন্দিরে ঢুকে পবিত্রতা নষ্ট করেছে—এই অসন্তোষ এবং উত্তেজনা ছড়িয়ে র‍্যাণ্ড এবং আয়ার্স্টকে যারা হত্যা করেছিল তারা জাতীয়তাবাদী ভারত-ইতিহাসে 'বীর'। দাঙ্গা বাধিয়ে দেওয়া হয় মহারাষ্ট্রের যত্রতত্র সরকারের দমননীতির বিরুদ্ধে হিন্দু নির্বোধ জনতাকে ব্রিটিশ এবং মুসলমানের বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে উত্যক্ত করে। তিলকের 'গণপতিমেলা' এক্ষেত্রে যে ভূমিকা নেয় তা হ'ল 'cuts away the very root of political unity, setting the lower orders of the Hindu population against the Mahomedan....'[৩]

কলকাতার অভিজাত হিন্দু উচ্চবর্ণ বাঙালি সমাজে তার তিন-চার দশক আগে থেকেই বৃদ্ধ প্রৌঢ়-যুবক নির্বিশেষে 'মুক্তি খ্যাপা'দের দাপাদাপি চলছিল। ব্রাহ্মসমাজের নতুন স্বর্গপথ সন্ধান ও তার নায়কদের অস্থিরতা তখন প্রশমিত হলেও তা আসলে মাতৃক্রোড়ে শিশুর প্রত্যাবর্তনজনিত 'প্লাসিবো'র স্থিরতা। কেশবচন্দ্র সেন আর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর হিন্দু পুতুলের (<'পৌত্তলিক') উপর রাগ করে নিরাকারের আলেয়ার পিছনে ছোটাছুটি করে হতোদ্যম হয়ে পুনঃপুনঃ পুতুলব্যাপারী হওয়া এবং শেষত জ্যান্ত ভগবান 'অক্ষর-জ্ঞানশূন্য'[৪] 'দক্ষিণেশ্বরের পাগল-ব্রাহ্মণ'[৫]-এর পদতলে লুটোপুটি খাওয়ার ইতিহাসই এর প্রমাণ। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর দাদা ব্রজগোপাল গোস্বামীর কীর্তনে 'প্রেমভক্তি উচ্ছ্বসিত হইতে দেখিয়া' কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে সঙ্কীর্তন প্রথা প্রবর্তন করেন। ১২৮৫ সালে কেশবত্যাগী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রস্তাবক এই বিজয়কৃষ্ণই (২ জৈষ্ঠ)। এর পরেই আবার বিজয়কৃষ্ণ হিন্দুশাস্ত্র থেকে উপদেশ সঙ্কলন করে বিতরণ আরম্ভ করেন। পূর্ববঙ্গে গিয়ে 'গীতা', 'পুরাণ', 'উপনিষদ' ও বিভিন্ন তন্ত্র থেকে নানা বিষয় সংকলন করেন। ১২৮৭ বঙ্গাব্দে পশ্চিমবঙ্গে এবং বিহারের নানাস্থানে 'হিন্দুশাস্ত্র হইতে সারসংকলন পূর্ব্বক গেরুয়া বসন পরিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ' ও তৎপরেই আবার স্ত্রীপুত্রাদি নিয়ে ব্রাহ্মসমাজে প্রত্যাবর্তন। পুনঃ কলকাতায় রামকৃষ্ণ-মুগ্ধতা ও 'বিহ্বল-হৃদয তৃপ্তি'! অতঃপর আবার ঢাকায় গিয়ে 'কাঙাল হরিনাথ মজুমদারের কীর্তনের দলে সম্মিলিত হইয়া ঢাকায ভক্তিবন্যা প্রবাহিত' করা। পরে যোগাসাধনায় মগ্ন হওয়া, তার পরে আবার বৈষ্ণবীয় ভাবাচ্ছন্নতার 'ইষ্টদর্শনাকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হইয়া বৃন্দাবনে গমন', নবদ্বীপের চৈতন্যোৎসবে বক্তৃতা-কীর্তন-ধর্ম্মপ্রচার। তৎপরে স্টীমারযোগে পুরী গমন ও আত্মহারা হওন এবং তিরোভাব (১৮৯৯)। মাত্র আটান্ন বছর বয়সের মধ্যে বিজয়কৃষ্ণের এই অস্থিরতা ও দোলাচলনৈপুন্য শচীশ-শ্রীবিলাসের পায়ের তলার সমাজ-মাটির পরিচয় উদ্ঘাটন করে। বিবেকানন্দের ক্ষেত্রেও তা-ই ঘটেছে। এঁদের সবারই ছিল তত্ত্ব নির্ণয়ে উন্মত্ততা, প্রাণের ব্যাকুলতা (প্রাণের দেবতাকে পাবার), অতৃপ্তি এবং শেষে কোন এক গুরুপদে শরণাগতি। একমাত্র প্রার্থনা বিবেক, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তি এবং হৃদযে শান্তিলাভ তথা পরমানন্দের তৃপ্তি। শচীশেরও তাই; কিঞ্চিৎ জলমেশানো হলেও শ্রীবিলাসেরও। আর এরকম দুধেজলে গলাগলি তো সেইকালের তথাকথিত মহৎপুরুষদের যাপিত সন্নিধিতেও : "এফ-এ পরীক্ষার পর নরেন্দ্রনাথকে বিবাহের জন্য তাঁহার পিতা পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন।... ... কিন্তু বিবাহে স্পৃহাহীন, আজন্ম সন্ন্যাসী নরেন্দ্রনাথ দার-পরিগ্রহে ঘোরতর আপত্তি জানাইলেন।... ... দূর সম্পর্কের আত্মীয় ডাক্তার রামচন্দ্র মহাশয়ের নিকট নরেন্দ্র নিজের

মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। রামচন্দ্র পরমহংসদেবের অন্যতম শিষ্য। তিনি নরেন্দ্রনাথকে দক্ষিণেশ্বরে যাইবার উপদেশ দিলেন। তদনুসারে তিনি কয়েকজন বন্ধু সমভিব্যাহারে শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। নরেন্দ্রনাথকে দেখিবামাত্র পরমহংসদেব চিরপরিচিতের ন্যায় তাঁহার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। একান্তে ডাকিয়া লইয়া তিনি এমনই ভাবে কথা বলিতে লাগিলেন যে, তিনি যেন দীর্ঘকাল নরেন্দ্রের প্রতীক্ষায় কালযাপন কবিতেছেন। ... ... কিন্তু তাঁহার অসাধারণ সরলতা দর্শনে যুক্তিবাদী নরেন্দ্রনাথের মনে একটা সংশয়ের উদ্রেক হইল। ... ... মনে হইল, ভগবান ভগবান করিয়া বোধহয় ব্রাহ্মণের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিয়াছে। ... ... নরেন্দ্রনাথ এই সময়ে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হইয়া সমাজে গিয়া নিয়মিত ধ্যান করিতেন। পৌত্তলিকতার উপর তাঁহার অন্যতম সহচর রাখালচন্দ্র ঘোষকে কালী প্রণাম করিতে দেখিয়া তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া তিবস্কার করেন। কারণ, রাখালচন্দ্র তাঁহার ন্যায় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিযা নিরাকার ব্রহ্মেব উপাসনা করিতেন।"[৬] সুস্পষ্টভাবে জীবনযাপনেব এই ধরন এবং আবেষ্টনীসহ মানুষীলীলার কল্পকাহিনী আঁকলেও রবীন্দ্রনাথের এই উপন্যাসকে 'তাত্ত্বিক' চিহ্নিত করে একটা কূট উদ্দেশ্য চবিতার্থ করে আসা হচ্ছে এ পর্যন্ত। তা হ'ল অপেক্ষাকৃত যুক্তি ও বোধ দিয়ে যারা উপন্যাস নামক শিল্প মাধ্যমের পাঠক, তাদেব কাছে শচীশ ও শ্রীবিলাসদের জন্ম-কর্ম হয়ে ওঠা শ্রেণির কদর্য স্বরূপটাকে ঝাপসা কবে রাখা। নিত্য পূজায় যাদের দেবত্ব প্রতিষ্ঠার নিরন্তব অভিজাত প্রয়াস এখনও কার্যকর, তাদের শ্রেণিস্বরূপটাকে যে যাপন, ভাব ও জান্তব সবরকমেই মেলে ধরেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁব এই উপন্যাসে! যে হিন্দুগোঁড়া পৌত্তলিক অধ্যাত্মবাদীরা সেই ১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথকে চিমটিসহ টিটকিরি দিয়েছিলেন "শ্রীল শ্রীযুক্ত সার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেটি, এল এল ডি, সাহিত্য সম্রাট"[৭] বিশেষণে, তাঁদের বংশধর-আত্মীয় এবং 'রেলিক'রা 'চতুরঙ্গ'র মতো জলজ্যান্ত সমাজ আখ্যানকে মনস্তত্ত্ব-রূপক-প্রতীক-এর ঘোমটা কফনে না ঢাকলে নিজেরাই তো দিগম্বর হয়ে যাবে, তাই লালশালু ঢেকে চতুরঙ্গের চারদিক চাপা রেখে বিশ্লেষণ!

।। ২।।

১৮৯৭ সালের কলকাতা ভারতের রাজধানী। তবুও তা ছিল আধা গ্রাম। নৈসর্গিক তো বটেই, মানসিকভাবেও সামন্ততন্ত্রী শাসন কাঠামো সমাজকে বেঁধে রেখেছিল প্রস্তরযুগীয় আচার-শাসন ও মূল্যবোধের নিগড়ে। সেখানে জৈববাসনার কোন মানসিক স্বাধীনতা ছিল না। এখন হাসি পাবে জানলে যে ১৯১৩ সালে 'Humanity' শব্দের ভাবানুবাদ করার কারণে বিপিনচন্দ্র পালের দ্বারা নিন্দিত হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ! বিপিনচন্দ্র তখন বাঙালি হিন্দু সমাজে অগ্নিপুত্র। তিনি লিখেছেন, "ইংরেজি হিউম্যানিটি রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানব। এই হিউম্যানিটি বস্তু আধুনিক য়ুরোপীয়েরা কল্পনাবলে সৃষ্টি করিয়াছেন, সাধনাবলে লাভ করেন নাই। ইহা কৃষ্ণত্ব ও শুক্লত্ব প্রভৃতির মতন একটা গুণবাচক শব্দ মাত্র, নিজস্ব বস্তুত্ব বা স্বরূপ ইহার কিছু নাই। .... আমাদের *নারায়ণ* কথা থাকিতে য়ুরোপীয় হিউম্যানিটিকে আমাদের ভাষাতে ও চিন্তাতে বিশ্বমানবরূপে প্রতিষ্ঠা করার কোন প্রয়োজন আছে কি।"[৮] এরও ১৭ বছর আগে কি অবস্থা ছিল এই সমাজের তা কল্পনা করা যায়? কল্পনা না করা

গেলেও চতুরঙ্গে তা ধরা আছে বাস্তবকল্প আখ্যানের আধারে। সেখানে দামিনীর মাথা ঠোকা আর শচীশের পায়ে ঠেলে শিহবিত হওয়াতেই জৈব বাসনার সমাজগ্রস্ত হাহাকাব সমুদগীর্ণ হয়েছে। উপনিবেশের অন্ধকার আচ্ছন্ন ভারতীয় সমাজ তো পরের কথা, ওই ১৯০০ সালের কাছাকাছি আমেরিকান সমাজের অবস্থা জানলেও ঝাঁকানি খেতে হয়; "যেখানে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের কাছেই দাম্পত্য জীবন একটা দুঃস্বপ্নের হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেখানেও সেটাকে বজায় রাখতে হবে, এই ছিল সর্ববাদিসম্মত জনমত। ফলে ছোটবড় প্রায় সব আমেরিকান শহরেই এমন কোন না কোন বয়স্ক দম্পতির দেখা পাওয়া যেত, যাঁদের পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ এত বেশি যে তাঁরা বছরের পর বছর পরস্পরের সঙ্গে কথা বলেননি, কিন্তু একই বাড়িতে থেকে, একই টেবিলে বসে খেয়ে, ছেলে মেয়েদের মানুষ করে এমনকি হয়তো একই বিছানায় শুয়ে সারাজীবন কাটিয়ে এসেছেন-আর দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে ভেবেছেন যে এটাই পবিত্র দাম্পত্যনীতিরক্ষার একমাত্র পথ।"[১] এই জৈব-নৈতিকতার যে নৈসর্গিক আবেষ্টনী বর্ণিত হচ্ছে, আমাদের 'চতুরঙ্গ'র 'প্লেগধ্বস্ত কলকাতা সবক্ষেত্রেই তার থেকে কয়েক যোজন পিছনেই দাঁড়িয়ে ছিল : "যাতায়াতের জন্যে তখন কেবলমাত্র রেলগাড়ি আর ঘোড়াগাড়ির উপর নির্ভর করতে হ'ত। টেলিফোনের প্রচলন তখনো বিশেষ হয়নি-রেডিও তো ছিলই না। ফলে বিভিন্ন অঞ্চল পরস্পর থেকে কতখানি বিচ্ছিন্ন ছিল, তা আজ আমাদের পক্ষে কল্পনা করাও কঠিন। ... ... তাদের জগৎ তাদের সীমানার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। পরিচিত পরিবেশ আর লোকজনের মধ্যেই তারা বাস কবত, আর প্রতিবেশী, বন্ধু বান্ধব বা আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে তাদের ভাবধারা বা দৃষ্টিভঙ্গির কোন অমিল ছিল না। কোন ব্যক্তিবিশেষের সাফল্য বা ব্যর্থতা তখন অনেকটা তার পরিচিত সীমানার ঘটনা বা কার্য-কারণ দিয়েই নির্ধারিত হ'ত। তাঁর পুত্র বা পৌত্রদের মত (অর্থাৎ পরবর্তী দু-তিন প্রজন্ম পর) তাঁকে অতটা অনুভব করতে হ'ত না যে তার পক্ষে সম্পূর্ণ দুর্জ্ঞেয় কোন কারণে তার ভাগ্য, এমনকি জীবনও, সুদূর মস্কো, বার্লিন বা ওয়াশিংটনে গৃহীত কোন সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর কবছে। নিজের বাড়ির জানলা দিয়ে যে-জগৎ তাব চোখে পড়ত সেটা সর্বদাই অনুকূল না হলেও, অন্তত দুর্বোধ্য ছিল না।"[১এ]

।। ৩ ।।

"একজন সন্ন্যাসীকে দেখিয়া একবার জ্যাঠামশায় বলিয়াছিলেন, "সংসার মানুষকে পোদ্দারের মত বাজাইযা লয়, শোকের ঘা, ক্ষতির ঘা, মুক্তির ঘা দিয়া। যাদের সুর দুর্বল পোদ্দার তাহাদিগকে টান মাবিয়া ফেলিয়া দেয়; এই বৈবাগীগুলো সেই ফেলিয়া-দেওয়াব মেকি টাকা, জীবনের কারবারে অচল।" - জ্যাঠামশাইয়ের এই সন্ন্যাসী সম্পর্কিত মূল্যায়ন শ্রীবিলাসের মাধ্যমে পাঠক পাঠিকা জানতে পারছে তাঁর মৃত্যুর দু-বছর পরের ঘটনা-বর্ণনার সম্প্রপাত সূচনায় (শচীশ/৩)। বাস্তবিকই তখনও পর্যন্ত 'আত্মমুক্তি'ই ছিল প্রবজ্যার মুখ্য মোক্ষ। অথচ জ্যাঠামশাইয়ের মৃত্যুর আগে কলকাতা থেকেই সন্ন্যাসের ভিন্নার্থ নির্মাণের সূচনা হচ্ছে। সূচক স্বামী বিবেকানন্দ। "আলমবাজারাবস্থিত অন্যান্য রামকৃষ্ণ-শিষ্য-সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দকে পরম সাদরে অভ্যর্থনা করিলেও সহসা তাঁহার প্রচারিত সন্ন্যাস ও কর্মযোগের আদর্শ গ্রহণ করিলেন না। ধ্যান-ধাবণা তপস্যার দ্বারা আত্মার

মোক্ষলাভের জন্যই তাঁহাবা চিরাচরিত প্রথা অবলম্বন পূর্ব্বক কালাতিপাত কবিতেছিলেন। স্বামীজী বুঝাইয়া দিলেন যে, প্রাচীন পদ্ধতি চলিবে না। নিজের মুক্তিই চবম কাম্য নহে। কোটি কোটি নরনারীব অজ্ঞতা দূর করিয়া তাহাদিগকে মুক্তির সন্ধান বলিয়া দিতে হইবে। এমন একটি সন্ন্যাসীসম্প্রদায় গঠন করিতে হইবে—যাহারা নিজের মুক্তি চাহেনা; দেশেব কল্যাণ কামনায় নরকে যাইতেও দ্বিধাবোধ করিবে না। "যত্র জীব তত্র শিব" এই মন্ত্রে বিরাটের, অনন্তের পূজা করিতে হইবে। পরার্থে আত্মোৎসর্গ করিতে না পারিলে মানবদেহ ধারণই বৃথা। ... স্বামীজির বক্তব্য ক্রমে সন্ন্যাসীবৃন্দের হৃদয়ে স্থান পাইল। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ঠাকুরেব পূজা ছাড়িয়া বেদান্ত প্রচারের জন্য দাক্ষিণাত্যে এবং স্বামী অখণ্ডানন্দ মুর্শিদাবাদ জেলায় দুর্ভিক্ষ পীড়িত নরনারীর সেবাব জন্য চলিয়া গেলেন। অন্যান্য গুরুভ্রাতারাও নানাপ্রকার কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন।"[১০] বিবেক-জ্ঞান-বৈরাগ্য-ভক্তির যে আত্মমোক্ষমার্গে একদশক আগে পথ চলা শুরু হয়েছিল, (চাক্ষুস) দেশবিশ্ব দর্শন তাব খাত বদলে দিল . "Great enterprise, boundless courage, tremendous energy, and above all, perfect obedience–these are only traits that lead to individual and national regeneration"[১১] জ্যাঠামশাই জগমোহন তার যাপন ও স্পন্দনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই সত্যই পালন করেছে গৃহী হয়েও। তার মৃত্যুর পর সন্ন্যাসের পথে ভেসে শচীশ পুরনো পন্থার কাদায় পা পিছলে তজ্জনিত আবেগ-অভিঘাতে হতচেতন। স্তব্ধতার মধ্যে যার সংযত হৃদয়ের গভীবতার পরিচয় পাওয়া যেত, সেই শচীশই তার নতুন জীবনপর্বকে বাগবিভূতি সঞ্চার করে ব্যাখ্যা দিয়ে বলে, "জ্যাঠামশায় যখন বাঁচিয়া ছিলেন তখন তিনি আমাকে জীবনের কাজের ক্ষেত্রে মুক্তি দিয়াছিলেন, ছোট ছেলে যেমন মুক্তি পায় মায়ের কোলে। দিনেব বেলাকার সে মুক্তিই বা ছাড়ি কেন।" ক্রমে এই পিচ্ছিল পথের অথৈ অতলই এই নব বায়সেব একমাত্র গন্তব্য হয়ে উঠতে থাকে। দামিনীকে তাই আরও খোলসা করে বলে, "উপবে ঢেউ দেখিতেছ বটে, কিন্তু ধৈর্য ধরিয়া ভিতরে তলাইতে পারিলে দেখিবে সমস্ত শান্ত।" অথচ দামিনী যখন ঝাঁপিয়েছে, অতল সন্ধানী 'শচীশের সর্বশরীব' ভযে কেঁপে উঠেছে। ১৮৯৭-১৯০০'র শতাব্দী-সন্ধির কলকাতার হিন্দু-বাঙালি অভিজাত সমাজ-যৌবনের এই অব্যবস্থিতচিত্ত জীবনকাহিনী রূপক হবে কেন? 'শচীশেব' 'ছুটিয়া ফিবিয়া' যাওয়া তার কালের সংশয়াপন্ন বাঙালি শিক্ষিত হিন্দু যৌবনের সাধাবণ ধর্ম। এ তার কালেব ধর্ম। পূর্বকাল এবং কালান্তরের মাঝামাঝি এর অবস্থান। কালান্তর ১৯০৫ পরবর্তী সশস্ত্র দীক্ষায়, যার পরিচয় রবীন্দ্রনাথেরই 'ঘরে-বাইরে'তে ভালরকম আছে, আছে সেকালের ইতিহাসেব আগুনে আব প্রধূমে। আর পূর্বকাল তো শচীশ শ্রীবিলাসরাও স্ব-সত্ত্বায় একদা যাপন করেছে : "একদিন যে এই কলিকাতার মেসে দিনরাত্রি সাধনা করিয়া পড়া করিয়াছি; গোলদিঘিতে বন্ধুদের সঙ্গে মিলিয়া দেশের কথা ভাবিয়াছি; রাষ্ট্রনৈতিক সম্মিলনীতে ভলানটিয়ারি করিয়াছি; পুলিশের অন্যায় অত্যাচার নিবারণ করিতে গিয়া জেলে যাইবার জো হইয়াছে; এইখানে জ্যাঠামশায়ের ডাকে সাড়া দিয়া ব্রত লইয়াছি যে সমাজের ডাকাতি প্রাণ দিয়া ঠেকাইব, সকলরকম গোলামিব জাল কাটিয়া দেশেব লোকেব মনটাকে খালাস করিব; এইখানকার মানুষের ভিতর দিয়া আত্মীয়-অনাত্মীয় চেনা-অচেনা সকলের গালি খাইতে খাইতে পালের নৌকা যেমন করিয়া উজান জলে বুক ফুলাইয়া চলিযা যায় যৌবনের শুরু হইতে

আজ পর্যন্ত তেমনি করিয়া চলিয়াছি—ক্ষুধাতৃষ্ণা সুখদুঃখ ভালোমন্দের বিচিত্র সমস্যায় পাক-খাওয়া মানুষের ভিড়ের সেই কলিকাতায় অশ্রুবাষ্পাচ্ছন্ন রসের বিহ্বতলা জাগাইয়া রাখিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলাম।"

শ্রীবিলাস বর্ণিত কলকাতার এই বর্ণনা একমাত্রিক। এ বর্ণনা তো সেদিনের ভারতবর্ষেরও। অথচ তার অন্য মাত্রারও খোঁজ পাই আমরা। সে কেবলই জাতীয় জীবনের অবনমনের। যেমন ব্রিটিশ ভারতীয় পুরাতন প্রদেশগুলোতে ১৮৯১ এর দশকশেষে ৯৭,৮০,০০০ বিঘা জমি কৃষিকাজের অযোগ্য হয়েছে।[১২] 'The prosperous British' বইয়ে মিঃ ডিগবী বর্ণনা করেছেন, "among other things we have destroyed native industries, and besides, have taken form India since 1834-5 (according to a calculation made by that sane moderate journal, the Economist two years ago. (in 1889) ... more than ten thousand millions of Rupees. India, on the other hand, has entirely lost her much more than ten thousand millions; this, with interest, and if circulated in the ordinary way among her people, at 5 p. c. interest value only, would by this time, have been of the value of least of fifty thousand millions of Rupees."[১৩] সখারাম গণেশ দেউস্কর লিখেছেন, "১৮৮০ সালে সমগ্র ভারতবর্ষে ৩৯,২৮,৬৩১ জন মরিয়াছিল; ১৯০০ সালে ৮৩,৩৪,১৫৫ জন ভারতবাসীর ভবলীলা সাঙ্গ হইয়াছে। সকল সভ্যদেশেই মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। দেশে খাদ্যাভাব ঘটায় অনেকেই দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। যে ভারতবাসী সহজে আপনাদিগের বাস্তুভিটা ত্যাগ করিতে চাহে না, ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে তাহাদিগের মধ্যে ১০,৭১২ জন জীবিকা হরণের জন্য কুলিরূপে বিদেশে গমন কবিয়াছিল, ১৯০১ সালে উহাদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ২১৬১৩ হইয়াছে। বিগত ১৮৯৩ হইতে ১৯০২- খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দশ বৎসরে ১ লক্ষ ৭৭ হাজার ৫৮৯ জন দেশত্যাগ করিয়াছে।... যাহারা স্বদেশ ত্যাগ করিতে পারে নাই, অন্নকষ্টে তাহাদিগেরও দুর্গতির শেষ নাই। ১৮৭৭ সালের দুর্ভিক্ষকালে যে ভারতবাসী চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন অপেক্ষা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা শ্রেয়স্কর মনে করিয়াছিল তাহারা এখন ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া তস্করবৃত্তি স্বীকারে, আর সঙ্কোচবোধ করিতেছে না। গত ১৮৮৯ সালের ১,৭৯,৯৭,০০০ জন চৌর্যপরাধে দণ্ডিত হইয়াছিল, ১৯০০ সালে ২,৪৯,৬৫,০০০ জন চুরি করিয়া দণ্ড পায়। অন্নক্লেশের ইহা অপেক্ষা শোচনীয় নৈতিক পরিণাম আর কি হইতে পারে।"[১৪]

|| ৪ ||

ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দী-সন্ধির অব্যবহিত পূর্বকালের কলকাতার হিন্দু এলিট বাঙালির জীবনের দুটো প্রবণতার দ্বন্দ্বের মাঝে রবীন্দ্রনাথ স্থাপন করেছেন তাঁর 'চতুরঙ্গ' আখ্যান। শচীশ ও শ্রীবিলাসের অন্তঃপাতী দামিনী এ দুই প্রবণতার সংযোজক, আবার বিয়োজকও। স্বার্থপর আত্মপ্রেম

অথবা বহুজন হিতব্রত এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা না করেই জ্যাঠামশাই প্লেগের শিকার হয়েছে। দ্বন্দ্বের বিস্তার শ্রীবিলাস-শচীশের দামিনীকে দেখা ও পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় সুপ্ত বনাম দীপ্ত, প্রাত্যহিক জৈব বনাম ভাবরসেব রসিকরূপে। এ দ্বন্দ্বে 'সৃষ্টিছাড়া' শচীশকে মনে মনে জয়মাল্যভূষিত কবে দামিনী শ্রীবিলাসকে পরিয়েছে নিষ্প্রাণ বরমাল্য। সুন্দরকে জিতিয়ে দেয় সে গড়পড়তাকে লাভবান করে। ভীরুতা নিঃসন্দেহে বৃহদংশে দায়ী এজন্য। যে দেশকালে জ্যাঠামশাই জনহিতব্রতে শচীশের মৃত্যু-পরবর্তীকালের ব্যবস্থাও করে রেখে যেতে পারে, সেই কালে 'বুদ্ধি', 'রস' কোনকিছুই শচীশকে কাঙ্ক্ষিত মুক্তি বা আশ্রয় দেয় না। সমকালের বাঙালি হিন্দু বিত্তশালী শ্রেণিব জীবনার্থের ট্রাজেডি বহন করতে হয় তাকে। বিবাগী হলেও তার আকাঙ্ক্ষায় পিতৃপক্ষেরই উত্তরাধিকার। তার শৈশব থেকে যে পিতৃ পরিমণ্ডলে বেড়ে ওঠা, তাতে তার দাদার যে যৌন-অপরাধমূলক আচবণ এবং হরিমোহনের জ্যেষ্ঠপুত্রের সমর্থনে সক্রিয়তা লক্ষ্য কবা যায়, শচীশ এই পুরুষতান্ত্রিক পশুত্বকে ঘৃণা করতে করতে বড় হয়েছে। এই ঘৃণার চোখে দেখা শচীশ জৈবিক মানুষেব যথাযথ জৈব পরিস্থিতিব চাহিদার কাছেও ভীত। এই জৈবিক অক্ষমতা আসলে মনে লালিত অনৈতিক জৈবিকতার প্রতি অতিরিক্ত বিরাগের ফলশ্রুতি। অ্যাডলার ব্যাখাত পৌরুষের আর্কিটাইপের একদিকে আছে বা থাকে শৈশবের অস্বাভাবিকতা থেকে বিকশিত জীবনে পুরন্দরের মতো নিপীড়ন, আগ্রাসন ও ধর্ষণ; অন্যদিকে দেখা যায় শচীশের মতো পলায়ন, ভীতি এবং অসাফল্যের ভয়। জ্যাঠামশাইয়ের পদনখসম হওয়ার যোগ্যতা তার ছিল না বলেই বিবেকানন্দের মানবসেবার নতুন হিন্দুত্বেব বর্মে শচীশের কুলোযনি। আবার সমকালে ক্ষীণ হলেও সমাজপ্রগতির যথার্থ ধারার ধারেকাছেও সে ছিল না, যে ধারার মর্মার্থ বিজ্ঞানবোধে আস্থা। 'পাত্রাধার কি তৈল, না তৈলাধার কি পাত্র' অথবা ভগবান (পরমেশ্বর) কে দ্যাখা যায়, না চাখা অথবা শোঁকা যায় কিংবা মাখা যায় —এই কুট সমস্যাতেই মেতে ছিল বঙ্গবাসী যে গরিষ্ঠ হিন্দু এলিট সমাজ, শচীশ তাদেরই আত্মীয়। এরা প্লেগ-থেকে আত্মরক্ষার্থে পালায়, এদের আত্মীয় শচীশ দায়িত্ব নিতে ভয় পায়, শিহরিত হয়ে পশচাদ্ধাবন করে নারীর জ্যান্ত কামনাকে জান্তব প্রতিপন্নে। ১৮৯৮ আর ১৮৯৯-এই দুই বৎসরের প্লেগে বাঙালি হিন্দু আত্মস্বার্থ সর্বস্ব বিত্তশালী সমাজের দুই রকমের বিচ্ছিন্ন আচরণ এদের তৎকালীন বন্ধ্যাত্বকে চিনিযে দেয়। 'শচীশ' অধ্যাযেব সূচনায় হবিমোহনের 'খুদে অক্ষরে দুর্গানাম লিখিয়া দিস্তাখানেক বালির কাগজ ভবিযা' কালনায় চলে যাওয়া ১৮৯৮ এর প্রথম প্লেগে। এক বছর পর ১৮৯৯ সালের প্লেগ-এর বর্ণনায রবীন্দ্রনাথকে লেখা বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর ২৫ এপ্রিল ১৮৯৯ এর চিঠিতে : "নীলরতন বাবুর নিকট এজন্য কযবার গিয়াছিলাম, কিন্তু সাক্ষাত হয় নাই। প্লেগেব ধূমধামে তিনি বড় ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহার কোন আত্মীয় তাঁহার অজ্ঞাতসারে এক প্লেগরোগী (মৃত) সৎকার করিতে লইয়া যান। সৎকাব করিযা গৃহে প্রবেশ করিবার পথে তাঁহার জন্য বিশেষ অভ্যর্থনার প্রয়োজন ছিল। প্রথমে করোসিব সাব্লিমেট জলে তাঁহাকে আপাদমস্তক স্নান করান হয় তার পর সমস্ত বহিরাবরণ (জুতা পর্যন্ত) রাজপথে কেরোসিন তৈলে দাহ করা হইয়াছিল। পৃথিবীতে মোটামুটি একটা সামঞ্জস্যেব নিয়ম আছে। এ দিকে এত সাবধানতা, অন্যদিকে মৃত রোগীর আত্মীয়রা মৃত ব্যক্তির জিনিষপত্র অন্ধ আতুরদিগের মধ্যে

বিতরণ করিয়াছেন।"[১৫] এই মনুষ্যত্ব-রিক্ত বাঙালি হিন্দু এলিটের জীবনার্থ সন্ধানের দিগভ্রষ্ট নায়ক শচীশ। কে বলে 'চতুরঙ্গ' সামাজিক উপন্যাস নয়? ১৮৯৮-১৮৯৯'র সমাজের মাটি খুঁড়তে এখনও, ১১৫ বছর পরেও প্লেগের ভয়!

## ।। উল্লেখপঞ্জি ।।


১. P. N. Chopra, Indian National Congress . Towards Militant Nationalism. Journal of Indian History, Dec. 1973, P.623

২. ibid, p. 626

৩. ibid, p. 625

৪. 'ভারত প্রতিভা', সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, 'বসুমতী সাহিত্য মন্দির' পৃঃ ১০৫

৫. তত্রৈব, পৃ. ১০৫

৬. 'ভারত প্রতিভা' পৃ. ৯৯-১০০

৭. যতীন্দ্রমোহন সিংহ, "একটা মোকর্দ্দমাব রায়, চলতি ভাষা বনাম সাধু ভাষা", 'নাবায়ণ' আষাঢ় ১৩২৪

৮. "অক্ষয়চন্দ্র ও সাহিত্য সম্মেলন" 'বঙ্গদর্শন' বৈশাখ ১৩২০

৯. 'রূপান্তর' ফ্রেডবিক লিউস অ্যালেন, পার্ল পাব. প্রা. লি (বোম্বাই), পৃ ১২-১৩

৯এ [সূত্র]-৯ ; পৃ. ১২-১৩

১০. 'ভাবত প্রতিভা', পৃ ১৫৫

১১. "স্বদেশেব দীক্ষা", 'বিপ্লবী বাংলা বা স্বাধীনতার ইতিহাস' গ্রন্থ থেকে উৎকলিত, শ্রীবাজেন্দ্রলাল আচার্য্য, 'স্টুডেন্টস লাইব্রেরি' ১৩৬৫, পৃ. ১৪০

১২ 'দেশের কথা' শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর, 'সাহিত্যলোক', ১৩৭৭ (প্রথম প্রকাশ ১৩১১), পৃ. ১৭

১৩. 'দেশেব কথা' পৃ. ১৮-১৯ থেকে উৎকলিত

১৪. 'দেশেব কথা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯-৮০

১৫. 'পত্রাবলী' জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু শতবার্ষিকী সমিতি' ৯৩/১ আপার সার্কুলার রোড। কলকাতা-৯, সম্পাদনা : শ্রীপুলিনবিহারী সেন, ৩০ নভেম্বর ১৯৮৫ পৃ. ৭


---

প্রবন্ধটিব প্রথম প্রকাশ মে'২০১০

# বাঙালির রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদ (১৯০৭-২০০৭) : প্রস্থানভূমি 'ঘরে-বাইরে'

স্বদেশী যুগের উত্তাপ সক্রিয়তার ক্ষেত্র খোঁজার জন্য যখন অস্থির, তখন বিপিনচন্দ্র পালের হিন্দু দেবী কালীর কাছে উৎসর্গের জন্য একশো একটা জ্যান্ত সাদা পাঁঠা বলিদানের আর্জি বাংলা তথা বাঙালির রাজনৈতিক কার্যক্রমে একটা নতুন প্রবণতার জন্ম দেয়। বিপিনচন্দ্রের সেই বক্তৃতা প্রদত্ত হয়েছিল ২৫মে ১৯০৭। সদ্য তা শতবর্ষ অতিক্রম করল। যে আন্দোলনের আগুনে ঘৃতাহুতির জন্য বিপিনচন্দ্রের এই নিষ্ঠুর আহ্বান ধ্বনিত হয়েছিল, কালের নিয়মে তা শমিত হলেও বিগত একশো বছরে ভারতীয় বাঙালির জীবনে এই রাজনৈতিক কর্মপন্থা কিন্তু অস্তিত্ব বজায় রেখেছে এখনও। সংজ্ঞা-পরিভাষায় একে কেউ বলেন 'চরমপন্থা', কেউবা বলেন 'হিংসা', কারও বা অভিধা 'সন্ত্রাসবাদ' নামে। এই পরিভাষাগুলোর মধ্যে সূক্ষ্ম ভেদ আছে, এখানে আমরা সেই শব্দার্থতত্ত্বে না ঢুকে সাধারণ অর্থটুকু জেনে নেব মাত্র। আমাদের মূল আলোচ্য হবে ১৯০৫ বা ১৯০৭ এর স্বদেশী রাজনীতির উত্তাপ মাখানো রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের প্রেক্ষণবিন্দুতে রেখে পরবর্তী একশো বছবেব বাঙালি জীবনে এই সন্ত্রাস, হিংসা বা চরমপন্থা কীভাবে থেকে গেছে তা অবহিত হওয়া এবং সর্বোপরি আমাদের কথাসাহিত্যে তার ছাপ অথবা ছোপগুলোকে চিহ্নিত করা। নির্দিষ্ট আন্দোলন প্রবণতার ভাল-মন্দ বিচার আমাদের উদ্দেশ্য নয়, কেননা আমরা কেউই খণ্ডকালের মহেশ্বর নই। বরং আমাদের খণ্ডিত ভাষা-জাতিসত্তার অভিজ্ঞান নিরূপণে এই রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদের ভূমিকাটুকু পর্যালোচনা করতে পারি এই অবকাশে।

'সন্ত্রাসবাদ' শব্দধারণার অর্থ প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে "রাজনৈতিক লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য হিংসাত্মক পদ্ধতি অনুসরণ অথবা হিংসার মাধ্যমে জনগণের মনে ভীতি ও ত্রাস সঞ্চার করা। নির্বিচারে যততত্র এবং ব্যাপকভাবে ভীতি ও ত্রাসসঞ্চারকারী হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপের দিকটি সন্ত্রাসবাদের সবচেয়ে ক্ষতিকর পরিণাম। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলেন বিপ্লব হল স্বৈরাচারতন্ত্রের (tyranny) বিরুদ্ধে সাম্য ও স্বাধীনতার স্বৈরতন্ত্র (despotism)।

সন্ত্রাসবাদের পিছনে ঔচিত্য হিসেবে এই যুক্তি দর্শানো হয় যে শুভলক্ষ্যে পৌছতে যদি অশুভ মাধ্যম অবলম্বনে আপত্তি না থাকে তা হলে সন্ত্রাসবাদ সমর্থনযোগ্য। নতুবা নিন্দনীয়। সাম্য ও স্বাধীনতার নামে হিংসার মাধ্যমে শোষণ ও নিপীড়নকারীরা হিংসা নিবারণের প্রয়াসী বলে

সন্ত্রাসবাদীরা মনে করে।" ১ সন্ত্রাসবাদী রাজনীতিকদের আর এক নাম 'চরমপন্থী'। এদের কর্মপ্রবণতার চারটি বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা হয় : (ক) "কোনও রাজনৈতিক চিন্তার ফলাফল, হিতাহিত সম্ভাব্যতা, যৌক্তিকতা, প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি নির্বিচারে শেষ সীমায় নিয়ে যাওয়ার প্রবণতা এবং মুখোমুখি সংঘর্ষে আসাই শুধু নয়, বিরোধী পক্ষকে খতম কবাও অভীষ্ট বিষয়। (খ) অপরের সব কিছু চিন্তাব প্রতি অসহিষ্ণুতা এবং অহিংসায় অনীহা। (গ) রাজনৈতিক লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য যে কোনও মাধ্যম অবলম্বন, যেটা প্রচলিত আচরণবিধি লঙ্ঘন করে, বিশেষ করে যেগুলি অপরের জীবন, স্বাধীনতা ও মানবিক অধিকারের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করে। (ঘ) বিক্ষোভ, বিদ্রোহ ও বিপ্লবের অস্পষ্ট লক্ষ্য ও আদর্শে বিশ্বাস এবং ক্ষমতা দখল ও সন্ত্রাসবাদী কৌশল প্রয়োগের চেষ্টা।"

।। ২।।

মূলত গুপ্ত সমিতি তৈরি কবে বাংলার জেলায় জেলায় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী কার্যকলাপ ছাড়িয়ে দিতে চেযে বাংলাব কংগ্রেস নেতৃত্বের একাংশ সন্ত্রাসবাদী রাজনীতিতে দীক্ষা নেন।এঁদের সিদ্ধিদাতা অরবিন্দ ঘোষ।তাঁর ভাই বারীন্দ্রকুমার ছিলেন অরবিন্দের ডান হাত।গুরুভজা হিন্দু আধ্যাত্মিকতার পারিবাবিক পরম্পরা থাকায় এঁদেব পক্ষে বয়কট-স্বদেশী-সন্ত্রাসবাদকে হিন্দু মোড়কে আবৃত করা সহজ হয়।এঁদের প্রথমপর্বের সঙ্গী মেদিনীপুরের বিপ্লবী হেমচন্দ্র কানুনগো অরবিন্দ প্রমুখের অলৌকিক শক্তিতে আশ্রয় নেওয়ার কারণ বর্ণনায় লেখেন, "এঁবা বড় বেশি কবে জেনে ফেলেছিলেন যে, ভারতের মতো দেশকে প্রকৃত স্বাধীনতা দিতে হলে, অতি বড় লৌকিক শক্তিসম্পন্ন নেতার পক্ষেও এক জীবনে সাফল্য লাভ করা কত কঠিন ও কত সুদূরপরাহত। এঁরা চেয়েছিলেন সহজে কাজ সাবতে, দু-পাঁচ বছরে নিজ কর্মের সুফল ভোগ করতে, অবতারেব পূজা পেতে, দেশের কোটি কণ্ঠে নিজ নামের জযধ্বনি শুনতে; আর চেয়েছিলেন, এঁদের অঙ্গুলি নির্দেশে দেশের লক্ষ লক্ষ লোককে চোখ বুজে প্রাণ দেওয়াতে।"৩ 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে সন্দীপের আকাঙ্ক্ষাও ছিল একইরকম।তার 'আত্মকথা'য় (তৃতীয়, পৃ. ৮২) বলা হয় : "আমি পৃথিবীতে এসেছি কর্তৃত্ব করতে।আমি লোককে চালনা করব কথায় এবং কাজে। সেই লোকের ভিড়ই আমার যুদ্ধের ঘোড়া। আমার আসন তার পিঠেব উপরে, তার রাশ আমার হাতে।তার লক্ষ্য সে জানে না, শুধু আমিই জানি।কাঁটায় তার পাযে বক্ত পড়বে, কাদায তার গা ভরে যাবে; তাকে বিচার করতে দেব না — তাকে ছোটাব।" নিখিলেশের আত্মকথা থেকেও (৪ নং, পৃ. ১০৯) সন্দীপেব স্বদেশীকালের মনোভাব জানা যায়।সে বলে, "আমি যখন কংগ্রেসের দলে ছিলুম তখন আমি বাজার বুঝে আধ সেব সত্যে সাড়ে-পনেরো সের জল মেশাতে কিছুমাত্র লজ্জা কবিনি। আজ আমি সেই দল থেকে বেরিয়ে এসেছি, আজও আমি এই ধর্মনীতিকেই সার জেনেছি যে, সত্য মানুষের লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য হচ্ছে ফললাভ।" বাস্তব ইতিহাসে দেখা যায় ১৯০৭ সালে কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশন থেকে বহু নেতা 'মডারেট'দের কর্মপন্থার সঙ্গে আপস করে চলতে পারার অক্ষমতায় দলত্যাগ করেন। তাঁরা বিচ্ছিন্ন এবং সংগঠিত উভয় পন্থাতেই বয়কট-স্বদেশীকে স্বদেশী সন্ত্রাসে রূপ দিতে সক্রিয় হয়েছিলেন। বঙ্গভঙ্গের আগে থেকেই অবশ্য 'নবশক্তি' সম্পাদক মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার 'ব্রতী সমিতি', ভবানীপুর কালীঘাটের 'সন্তান

সম্প্রদায়', 'সাহিত্য' পত্রিকা সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির 'বন্দেমাতরম সম্প্রদায়', দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের গৃহে স্থাপিত 'স্বদেশী মণ্ডলী' কলকাতার 'ফিল্ড অ্যানয় একাডেমি ক্লাব', বরিশালের 'স্বদেশ বান্ধব সমিতি' এবং সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'ডন সোসাইটি' প্রভৃতি স্বদেশী প্রচারক সমিতি কাজ করত। ১৯০৭ সালে ব্রিটিশ সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ এমন ১৯টা সমিতির সক্রিয়তা সম্পর্কে খবর রাখত। সবচেয়ে সুসংগঠিত দল ছিল পুলিন দাসের 'ঢাকা অনুশীলন সমিতি' আর শৃঙ্খলিত সংগঠন-কাঠামো ছিল অশ্বিনীকুমার দত্তের 'স্বদেশবান্ধব সমিতি'র, এর ১৭৫টা গ্রাম-শাখা ছিল। এই গুপ্তসমিতির নেতা-নেতৃত্বের যে বৈশিষ্ট্যগুলো হেমচন্দ্র কানুনগো বর্ণনা ও সূত্রায়িত করেছেন 'ঘরে-বাইরে' সম্পর্কেও তা মনে রাখা জরুরি—বিশেষত সন্দীপ-অমূল্যর সম্পর্কের উন্মোচনটা বুঝে নেবার জন্য। হেমচন্দ্রের ব্যাখ্যায় :

১. 'স্বল্পশিক্ষিত যুবকরা বেশিরভাগ এই কাজে উৎসাহ ও আগ্রহ দেখাত।'

২. '...যত যুবক ঝাঁপিয়ে এসেছিল, তাদের মধ্যে খাস কলকাতাবাসী কম ছিল। তাদের পনেরো আনাই কলকাতার বাইরের ছেলে।

৩. 'নেতারা (বড় নেতাও) অধিকত বাক্যবাগীশ : ক্বচিৎ দু-একজন যারা দীক্ষাও নিয়েছিল, তাদেরও পনেরো আনা কিছুই করেনি, আর যারা একটু-আধটু কিছু করেছিল, তারা কাজের সময় 'চাচা আপনা বাঁচা' লৌকিক বেদের এই বাক্যটা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল।'

৪. অনেক গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন 'সৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মিথ্যা' বলায় সিদ্ধবাক, অত্যন্ত বাড়িয়ে, নিছক কল্পনা থেকে অভ্যাসবশত মিথ্যা বলতেন।

৫. এক জেলার 'রংরুট'দের উদ্দীপ্ত করতে অন্য জেলা সম্পর্কে মিথ্যা বাড়িয়ে বলা হত খতিয়ান বর্ণনার সময়।

৬. লোকের মনে গুপ্ত সমিতির আদর্শ শেকড় গাড়ছে না দেখে পরবর্তী প্রক্রিয়ায় লোককে হিপনোটাইজ বা সম্মোহিত করার জন্য মিথ্যা কথা বলেও ফললাভ না হওয়ায়—"তাঁরা ভাব প্রচারের সময় ধর্মের ফোড়ন আর ভগবান, কালী, দুর্গাদির দোহাই দিতে শুরু করেছিলেন।" এই তত্ত্বের প্রবক্তা দেব্রবত বসু। এঁর প্রভাবেই বারীন ঘোষ বরোদায় চলে যান।

৭. ভাঙনের কারণ : "গুপ্ত সমিতিতে যাঁরা প্রথমে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের প্রায় সকলের স্বভাবের মধ্যে কর্তৃত্বস্পৃহা এত প্রবল ছিল যে, অন্যের মন্তব্য বা উপদেশ সহ্য করতে একেবারে পারতেন না। অধিকন্তু যারা তাদের আধিপত্য বা মতামত অবনতমস্তকে স্বীকার না করত, তাদের লোকের কাছে ছোট করবার বা তাড়াবার জন্য নিতান্ত হীনতম উপায় অবলম্বন করতেও দ্বিধাবোধ করতেন না।"

৮. হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক বিষয়ে হিন্দু-নেতৃত্বের গৃহীত মত : "...এ সমস্যা সমাধানের যত প্রকার মতলব খুঁজে বার করবার চেষ্টা হয়েছিল, তার মধ্যে যেটা অপেক্ষাকৃত সঙ্গত ও সহজ বলে তখন গৃহীত হয়েছিল, সেটা হচ্ছে এই যে, মুসলমানগণ যদি এই বিপ্লবে যোগ দেয়, তবে ভালই; দেশ স্বাধীন হলে, তাদের সাহায্যের পরিমাণ অনুযায়ী অধিকার তাদের দেওয়া যাবে, আর যদি তা না করে, তাদিগকে শত্রু ইংরেজের সামিল বলে গণ্য করা হবে।"

।। ৩।।

'ঘরে-বাইরে উপন্যাসের বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এখানেও সন্দীপের নেতৃত্বে স্বদেশী উগ্রতার অভিযান শুরু হয়েছে *হিন্দুত্বের মোড়কে* "হঠাৎ পাগড়ি-বাঁধা গেরুয়া-পরা যুবক ও বালকের দল খালি-পায়ে আমাদের প্রকাণ্ড আঙিনার মধ্যে, মরা নদীতে প্রথম বর্ষার গেরুয়া বন্যার ধারার মতো, হুড়্‌হুড়্ করে ঢুকে পড়ল।" *নেতাদের প্রভু-সুলভ আচরণ*-বিচরণ এখানেও লক্ষ করা যায় : "সেই ভিড়ের মধ্য দিয়ে একটা বড়ো চৌকির উপর বসিয়ে দশ-বাবোজন ছেলে সন্দীপবাবুকে কাঁধে করে নিয়ে এল। বন্দে মাতবম বন্দে মাতরম! বন্দে মাতরম।" তার চার সংখ্যক আত্মকথায় সন্দীপের নিজের ভাষ্যও এই প্রভুত্বেব অনুকূলে : " পৃথিবীতে একদল জীব আছে তারা পদতলচর, তাদেব সংখ্যাই বেশি। তারা কোনো কাজই করতে পারে না যদি না নিয়মিত পায়ের ধুলো পায়, তা পিঠেই হোক আর মাথাতেই হোক।" আপাত অবলোকনে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে পরিবেষ্টনীর সমাজের বিরোধী কার্যকলাপ লক্ষিত না হলেও সন্ত্রাসবাদ *দ্রুত সমাজবিরোধীদের রং এবং 'রুট' বদলে নিতে সাহায্য করে*। 'ঘরে-বাইরে'তে বিমলার আত্মকথায় বলা হয়েছে : "সন্দীপবাবু যখন এখানে এসে বসলেন তার চেলারা চার দিক থেকে আনাগোনা কবতে লাগল, মাঝে মাঝে হাটে বাজারে বক্তৃতাও হতে লাগল—তখন এখানেও ঢেউ উঠতে লাগল। একদল স্থানীয় যুবক সন্দীপের সঙ্গে জুটে গেল। তাদের মধ্যে *এমন অনেকে ছিল যারা গ্রামেব কলঙ্ক*। উৎসাহের দীপ্তির দ্বারা তারাও ভিতবে বাহিরে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।" সন্ত্রাসবাদের আর এক বৈশিষ্ট্য *সাধারণ মানুষের ওপর মতাদর্শের নামে আসুরিক বল ও ভীতি প্রদর্শন*। 'ঘরে-বাইরে'তে সাধারণ মানুষকে 'জবরদস্তি' করে নিজেদের কর্মসূচীতে অংশ নিতে বাধ্য করার যে বর্ণনা বিমলার আত্মকথায় পাওয়া যায় তা এইবকম : "আমাদের সন্দীপ এসে বললেন, এত বড়ো হাট-বাজার আমাদের হাতে আছে, এটাকে আগাগোড়া স্বদেশী করে তুলতে হবে। এই এলাকা থেকে বিলিতি অলক্ষীকে কুলোর হাওয়া দিয়ে বিদায় করা চাই। আমি কোমর বেঁধে বললুম, চাই বৈকি। সন্দীপ বললেন, এ নিয়ে নিখিলের সঙ্গে আমার অনেক কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে, কিছুতে পেরে উঠলুম না। ও বলে *বক্তৃতা পর্যন্ত চলবে, কিন্তু জবরদস্তি চলবে না।*' এছাড়াও এই জবরদস্তি লক্ষ কবা যায় নিখিলেশেব চতুর্থ আত্মকথায বর্ণিত মাস্টারমশাই চন্দ্রনাথবাবু ও নব্যস্বদেশী ছোকরাদের কথোপকথনে। সন্ত্রাসবাদ এর *আশ্রিতের ভাবনা ও বিশ্বাসের তথা সত্যের নৈতিক ভিত্তি বদলে দেয়*। পঞ্চুর জমিদার হরিশ কুণ্ডু স্বদেশী ছেলেদের নিয়ে পঞ্চুর বিলিত কাপড় পুড়িয়ে দেবার পব নিখিলেশ 'প্রত্যক্ষদর্শী' সন্দীপকে ফৌজদারী মামলাব সাক্ষী হবার

কথা বললে অকপটে সন্দীপ বলে : "দেব বৈকি। কিন্তু আমি যে ওর জমিদারের পক্ষে সাক্ষী।..যেটা ঘটেছে সেটাই বুঝি একমাত্র সত্য?...('অন্য সত্যটা') যেটা ঘটা দরকার। যে সত্যকে আমাদের গড়ে তুলতে হবে। সেই সত্যের জন্যে অনেক মিথ্যে চাই—যেমন মায়া দিয়ে এই জগৎ গড়া হচ্ছে।" সন্ত্রাসবাদ *শোষিত-লাঞ্ছিত মানুষের মধ্যে ধর্ম-ভাষা-গোষ্ঠী-বর্ণ—ইত্যাদি নিয়ে অমানবিক বিদ্বেষ ছড়ায়* স্থান-কাল-পরিপ্রেক্ষিতে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে। 'ঘরে-বাইরে'তে এটা মুসলমান বিদ্বেষের আকারে লক্ষ করা যায়। এই বিদ্বেষ নিয়েই সন্দীপ বলে, "ভাই-বেবাদার বলে অনেক গলা ভেঙে শেষকালে এটা বুঝেছি, গায়ে হাত বুলিয়ে কিছুতেই মুসলমানগুলোকে আমাদের দলে আনতে পারব না। ওদের একেবারে নীচে দাবিয়ে দিতে হবে, ওদের জানা চাই, জোর আমাদেরই হাতে। আজ ওরা আমাদের ডাক মানে না, দাঁত বের করে 'হাঁউ' করে ওঠে; একদিন ওদের ভালুক-নাচ নাচাব।" সন্ত্রাসবাদের অনিবার্য গন্তব্য *অন্তর্বিরোধের মধ্যবর্তিতায় আত্মখণ্ডন*। বিমলার ষষ্ঠ আত্মকথায় অমূল্যকে গুরু সম্পর্কে বলতে শোনা যায় : "সন্দীপ! তোমার কাছে এলুম বলেই তো ওকে চিনতে পেরেছি।...আমাকে যে কতখানি বঞ্চিত করেছে সে আমি কাকে বলব? এ আমি কখনো মাপ করতে পারব না। দিদি ওর মন্ত্র একেবারে ছুটে গেছে। তুমিই ছুটিয়ে দিয়েছ।" বাংলায় সন্ত্রাসবাদী রাজনীতি সূচনাকাল থেকেই নারীর স্নেহসিঞ্চন পেয়ে এসেছে নানাভাবে। তার মানে এই নয় যে বাঙালি নারী বিগত একশো বছরে দেশপৃথিবীর অন্য জাত-বেজাতের নারীর থেকে বেশি রাজনীতি জ্ঞানী। যুবক ও কিশোর সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি বাঙালি নারীর স্নেহ ও প্রীতির যৌন-ভারাতুবতা এক্ষেত্রে মূলত কার্যকরী প্রেরণা। অমূল্য সম্পর্কে বিমলার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করলেই এই যৌন-বসায়ন বোঝা যাবে : "কিন্তু অমূল্যর সেই আত্মোৎসর্গের দীপ্তিতে-সুন্দর বালকের মুখখানি যে কিছুতে ভুলতে পারছিনে। সে তো চুপ করে বসে ভাগ্যের প্রতীক্ষা করেনি, সে যে ছুটে গেল বিপদের মাঝখানে। আমি নারীর অধম তাকে প্রণাম করি—*সে আমার বালক দেবতা,*.....বাছা আমার, তোমাকে প্রণাম। ভাই আমার, তোমাকে প্রণাম। নির্মল তুমি, সুন্দর তুমি, বীর তুমি, নির্ভীক তুমি, তোমাকে প্রণাম। জন্মান্তরে *তুমি আমার ছেলে হয়ে আমার কোলে এসো,* এই বর আমি কামনা করি।"

সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির সংগঠকরা *নিজেদের ন্যায়যোদ্ধা প্রতিপন্ন করে*। তাদের থাকে ঘোষিত শত্রু। কিন্তু সংঘাত বা সংঘর্ষের জন্য তারা ঘোষিত শত্রুর মুখোমুখি হয় না সবসময়। ছদ্ম-শত্রু তৈরি করে নিয়ে অনেকসময় তারা এক ঝুটো রণাঙ্গণে উত্তাপ সঞ্চার বা শিথিল করে। 'ঘরে-বাইরে'র সন্দীপ ও তার দলবল এমনভাবে ইংরেজকে ভুলে বাংলাদেশের স্বজাতি-স্বভাষী বাঙালি মুসলমানদের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘাতের ক্ষেত্র তৈরি করে নেয়। বস্তুত উপন্যাসটার আখ্যান অন্তিম বিন্দু ছুঁয়েছে এই মুসলমান-বিদ্বেষ ও সংঘর্ষের ভয়াবহ অবস্থা বর্ণনায়। বিমলার ৭ সংখ্যক আত্মকথায় ১৯০৭-এর বাংলায় স্বদেশী সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা উত্যক্ত বাঙালি মুসলমানের রক্তাক্ত প্রতিক্রিয়া-সূচনা বর্ণিত হয়েছে : "সন্দীপ-দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বললে, আমার সময় নেই নিখিল! খবর পেয়েছি, মুসলমানের দল আমাকে মহামূল্য রত্নের মতো লুঠ করে নিয়ে তাদের গোরস্থানে পুঁতে রাখাবার মতলব করেছে।" চন্দ্রনাথবাবুও নিখিলেশকে বলে, "নিখিল, মুসলমানের দল খেপে উঠেছে। হরিশ কুণ্ডুর কাছারি লুঠ

হয়ে গেছে। সেজন্যে ভয় ছিল না, কিন্তু মেয়েদের উপর তারা যে অত্যাচার আবম্ভ করেছে সে তো প্রাণ থাকতে সহ্য করা যায় না।" হিন্দু স্বদেশীরাই শুধু নয়, সামগ্রিকভাবেই জাতিয়তাবাদী পরিমণ্ডলে মুসলমান-বিদ্বেষ ছিল একটা সাধারণ ব্যাপার। ১৯৪৯ সালে 'বিপ্লবী বাংলা বা স্বাধীনতার ইতিহাস' গ্রন্থে রাজেন্দ্রলাল আচার্য লিখেছেন : '. .মুসলিম স্বার্থরক্ষার উপলক্ষ করে স্থাপন করেছিলেন 'মুসলেম লীগ' নামক প্রতিষ্ঠান যার আগুনের আঁচে বাংলা দেশ জ্বলে উঠেছিল এই সেদিন। প্রথম ফল দেখা যায় বাঙ্গালার স্বদেশী আন্দোলনের যুগে। তখন বহু মুসলমান দেশের এই নবজাগরণের পথে বাধা দিয়েছিলেন এবং তারই অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ বাঙ্গালা দেশের নানাস্থানে দাঙ্গাহাঙ্গামা, অগ্নিকাণ্ড, লুণ্ঠন, নাবীনিগ্রহের ইয়ত্তা ছিল না। হিন্দু যুবকগণ মাতা ভগ্নী পত্নী প্রভৃতির সম্মান রক্ষার জন্য তখন দৃঢ় করে লাঠি ধরেছিল বলেই সে সময়কার অত্যাচার বন্ধ হয়েছিল।"[৪]

।। ৪ ।।

ব্যাপকভাবে বাঙালির রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সন্ত্রাসবাদে আশ্রয় নেওয়ার দুটো পর্বকে ছুঁয়ে আছে 'ঘরে-বাইরে'। প্রথম পর্বটা ১৯০৫ থেকে ১৯১২ পর্যন্ত বিস্তৃত। এর মধ্যে সবথেকে বেশি উত্তপ্ত ১৯০৭-ই উপন্যাসের প্রেক্ষিত কাল। এই পর্বের শেষ বড় ঘটনা "১৯১২ সালে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ হাতিব পিঠে চড়ে শোভাযাত্রাসহকারে নবনির্মিত নতুন দিল্লি শহরে প্রবেশ করার সময় বিপ্লববাদীদের নিক্ষিপ্ত বোমায আহত হওয়া। এই দুঃসাহসিক অভিযানেব নায়ক ছিলেন রাসবিহারী বসু।"[৫] পববর্তী পর্যায় ১৯১৫ থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত প্রসারিত। ১৯১৫-র ২১ ফেব্রুয়াবি রাসবিহারী বসু ও শচীন সান্যালের পরিকল্পিত পশ্চিম ভারতের ফিরোজপুর, লাহোর ও রাওয়ালপিণ্ডিতে সেনাবিদ্রোহের পরিকল্পনা ফাঁস হযে যায়। শচীন সান্যালের যাবজ্জীবন কাবাদণ্ড হয়, ফাঁসি হয় এই দুই বাঙালির সহযোগী পিংলের। রাসবিহারী আত্মগোপন করেন। ১৯১৫ সালের ৯ সেপ্টেম্বর অসমসাহসিক মবণজয়ী সম্মুখসমরে উড়িষ্যার বালেশ্বরে পাঁচজন বাঙালির লড়াই চিরস্মরণীয়। এঁরা হলেন বাঘাযতীন (যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়), নীরেন্দ্র দাশগুপ্ত, জ্যোতিষ পাল, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত ও চিত্তপ্রিয় রায়। পরবর্তী রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদের পর্যায়সূচনা ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের অভিযানে। জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধে নিহত হন ১১ বাঙালি বিপ্লবী। ২৩ এপ্রিল ঘটে এই সম্মুখ যুদ্ধ। ৬ মে তারিখের সংঘর্ষে নিহত হয় চারজন বাঙালি যোদ্ধা। ১৯৩০ সালের ২৫ আগস্ট ডালহৌসি স্কোয়ারে পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্টের গাড়ি লক্ষ করে বোমা নিক্ষেপ, ২৯ আগস্ট ইন্সপেক্টর জেনারেল লোম্যানকে গুলি করে হত্যা, ৮ ডিসেম্বর ১৯৩০ রাইটার্স বিল্ডিংয়ে ঢুকে কারা বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল কর্নেল সিম্পসনকে হত্যা, ১৯৩১ সালের ১৪ ডিসেম্বর শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী নামে দুই কিশোরীর দ্বারা কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেনসনকে গুলি চালিয়ে হত্যা, ১৯৩২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন সেনেট হল-এ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বীণা দাশের গভর্নর স্ট্যানলি জ্যাকসনের উদ্দেশ্যে গুলি নিক্ষেপ এবং দার্জিলিঙয়ে লেবং রেসকোর্সের মাঠে বাংলার অত্যাচারী গভর্নর সার জন আণ্ডারসনকে গুলি করে হত্যার চেষ্টা ও

ধরা পড়ে ১৪ বছর কারাবাস করেন উজ্জ্বলা মজুমদার। ১৯৩২ সালের ১৩ জুন ধলঘাটে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন দু'জন বাঙালি বিপ্লবী। ১৯৩২ এর ২৪ সেপ্টেম্বর প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার বিপ্লবীদের ইওরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণে নেতৃত্ব দেন—প্রীতিলতা গ্রেপ্তার হওয়ার বিকল্পে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেন। ১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে চট্টগ্রামে নৈরালা গ্রামে আত্মগোপনে থাকা সূর্য সেনের গ্রেপ্তার এবং ১৯৩৪ সালের ১২ জানুয়ারি তাঁর ও তারকেশ্বর দস্তিদারের ফাঁসিতে এই পর্বের সমাপ্তি।

বাঙালির রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদের তৃতীয়পর্ব পর্যন্ত ছিল ভারতকে স্বাধীন করার মহৎ আকাঙ্ক্ষার প্রেরণা। ১৯৩০-'৩৪-এর এই শেষপর্বে সন্ত্রাসে অংশ নিয়ে ধরা পড়ে যারা কারাবন্দী হন তাদের মধ্যে আত্মসমীক্ষার ভিতর দিয়ে ভাবনা-উত্তরণ ঘটে ব্যাপক সংখ্যায়। গোপাল হালদারের 'একদা' উপন্যাসের নায়ক অমিতের নানান দ্বিধার মধ্য দিয়ে শেষপর্যন্ত সব রাস্তায় গন্তব্য সাম্যবাদের মহাসরণি—এই উপলব্ধি বুঝিয়ে দেয় বাঙালির রাজনীতি ভাবাবেগ ছেড়ে তাত্ত্বিকতার ঘেরাটোপে বন্দী হচ্ছে। জেলের মধ্যে বহু বিপ্লবী কমিউনিজমে আস্থাশীল হন। পরে তাঁরা চারের দশকে স্বাধীনতা-পূর্ব এবং পরবর্তী সময়ে 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি'র কার্যক্রমে অংশ নেন। ১৯৪৮ সালের ২৩ মার্চ স্বাধীন দেশের তদারকি সরকার এই কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করে, দমন-পীড়ন হয় ব্রিটিশের সন্ত্রাসবাদ দমনের 'স্টাইলে'। ১৯৫০ সালের ৪ মার্চ কলকাতা হাইকোর্ট পার্টিকে বৈধ ঘোষণা করে। তা সত্ত্বেও আরও দেড় বছর কারাবন্দী রাখা হয় এবং নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে কমিউনিস্টদের মুক্তি দেওয়া হয় ১৯৫১ সালের ডিসেম্বরে। অব্যবহিত পরবর্তীকালে দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন। এই নির্বাচনে অংশ নিয়ে দেশের পীড়িত মানুষের সার্বিক মুক্তি সম্ভব কিনা এই বিতর্কই প্রায় ১৫-১৬ বছর অমীমাংসিত থাকার ফলে বাঙালির রাজনৈতিক চিন্তাভাবনায় সন্ত্রাসবাদের চোরা মোহ পুনরাবির্ভূত হয়। ১৯৬৭ সালের ২৪-২৫ মে' দার্জিলিঙে নকশালবাড়িতে আদিবাসী কৃষক ও জোতদারের দালালি করতে আসা রাজ্য সরকারি পুলিশের সংঘর্ষ থেকে যার সূচনা। ১৯৬৯ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত অবিমৃশ্যকারী পরিচালনা এবং বিপ্লব সম্পর্কে বায়বীয় ভাবাবেগ একে এমনই কানাগলিতে ঢুকিয়ে দেয় যে এই আন্দোলনের নামে সন্ত্রাসে নামা যুবক বাহিনীকে শাসকশ্রেণির প্রতিভূ রাজনৈতিক দল কংগ্রেস বিপ্লবী রাজনৈতিক পন্থার বিরুদ্ধে কাজে লাগায়। কংগ্রেসেরই নেতা সুশীল ধাড়া ৫ জানুয়ারি ১৯৭৩ সালে এই আন্দোলনকে 'কংশাল' শব্দবন্ধে চিহ্নিত করেন। আমাদের কাব্য-উপন্যাস-গল্প-প্রবন্ধে এখনও এই ভ্রান্তিকে সত্যসন্ধানী চিহ্নিত করে মড়াকান্নার বিরাম নেই। বিগত চারদশকে ব্যাক্তিনামে চিহ্নিত অজস্র দল তৈরি হয়েছে 'নকশাল' উত্তরাধিকার নিয়ে। তবে মধ্যবিত্তের আর লিটল ম্যাগাজিনের কাগুজে লেখার মধ্যেই সর্বস্ব নিবেদন করার ফলে এই নকশালপন্থা বাঙালি সমাজে নির্বিশেষে ঢোঁড়াসাপের মর্যাদা পেয়ে গেছে। কিন্তু ২০০৪ সালের ২১ সেপ্টেম্বর থেকে 'মাওবাদ' নামে চিহ্নিত হয়ে বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও পুরুলিয়া জেলার বিহার-উড়িষ্যার সীমান্তবর্তী মালভূমি অঞ্চলে যে রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রম সূচিত হয়েছে, প্রবণতার দিকে দিয়ে তা ভিন্ন। গেরিলা দল তৈরি করে ঝটিকা আক্রমণে তৎকালীন প্রধান শাসকদলের

আঞ্চলিক নেতা-কর্মীদের বাড়ি গভীর রাতে বা দিনের সুবিধাজনক সময়ে ঘেরাও করে খুন, আগুন লাগানো এবং দ্রুত গা ঢাকা দেওয়া—এটাই এই রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদীদের কার্যক্রমের মুখ্য প্রবণতা। ডিটোনেটর সহযোগে জঙ্গলঘেঁষা রাস্তায় মাইন পুতে রেখে টহলদার পুলিশবাহিনীর গাড়ি বিস্ফোরণে উড়িয়ে দিয়েও এঁরা অস্তিত্ব জানান দেওয়া পছন্দ করছেন। কেন্দ্র ও বাজ্য সরকার নানান 'টাস্কফোর্স', 'কল্যাণপ্রকল্প' ইত্যাদির কথা ঘোষণা করেও এই সীমান্তপ্রান্তিক রাজনৈতিক সন্ত্রাস প্রশমনে সমর্থ হয়নি। ২০০৫ এর জুলাই থেকে ২০০৭ এর জুলাই পর্যন্ত দু'বছবে এঁদের দ্বারা পশ্চিবঙ্গের প্রধান শাসকদল সিপিআই(এম)-এর ১৭ জন নেতাকর্মী খুন হয়েছেন। সেই অর্থে এই রাজনৈতিক হননপ্রবণতায় বাঙালির রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদ শতবর্ষের বিবর্তন স্পর্শ করেছে। প্রেক্ষাপট-কাল-মাত্রা ইত্যাদির মৌলিক ভিন্নতা সত্ত্বেও এই হননমূলক রাজনীতি আমাদের শতবর্ষ পূর্বের স্বদেশী-সন্ত্রাসকেই মনে পড়ায়। সেখানেও আমরা দেখেছিলাম জাতিব ভৌগোলিক মানচিত্র খণ্ডিত হওয়ার আহত মনোক্ষোভ কীভাবে একটা নিয়ন্ত্রণহীন জিঘাংসার মত্ততা এবং নৈরাশ্য- প্রতিক্রিয়ার চরিতার্থতায় ঢুকে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের মতো প্রজ্ঞাবান শিল্পী যার অনিবার্য কু-প্রভাব দিব্যদর্শন করেই যেন নিজের ১৯০৫ সালেব মনোভাব ও অবস্থান থেকে সরে এসে ১৯১৫-১৬ সালে লেখেন 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাস। কেন স্বদেশী সম্পর্কে নিজের মনোভাব ও ধ্যানধারণা এতটা বদলাতে হল রবীন্দ্রনাথকে ?

।। ৫ ।।

১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হবার (২০ জুলাই) পর 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শন'-এ রবীন্দ্রনাথ লেখেন : ''বাহিরেব কিছুতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিবে, একথা আমরা কোনও মতেই স্বীকার কবিব না। কৃত্রিম বিচ্ছেদ যখন মাঝখানে আসিযা দাঁড়াইবে, তখনই আমরা সচেতন ভাবে অনুভব কবিব যে, বাঙ্গালার পূর্ব-পশ্চিমকে চিবকাল একই জাহ্নবী তাঁহার প্রসারিত আলিঙ্গনে গ্রহণ করিয়াছেন। এই পূর্ব্ব-পশ্চিম, হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ বাম অংশের ন্যায়, একই পুরাতন রক্তস্রোত সমস্ত বঙ্গদেশের শিবায় উপশিরায় প্রাণ বিধান করিয়া আসিয়াছে—জননীর বাম দক্ষিণ স্তনের ন্যায় চিরদিন বাঙ্গালীব সন্তানকে পালন কবিয়াছে। আমরা প্রশ্রয় চাহি না—প্রতিকূলতার দ্বাবাই আমাদের শক্তির উদ্বোধন হইবে। বিধাতার রুদ্র মূর্ত্তিই আজ আমাদের পরিত্রাণ। জগতে জড়কে সচেতন করিযা তুলিবাব একমাত্র উপায আছে—আঘাত, অপমান ও অভাব; সমাদর নহে, সহাযতা নহে, সুভিক্ষা নহে।'' ১৯০৭ সালে করাচিতে নিখিল ভারত কংগ্রেস দ্বিখণ্ডিত হয় 'মডারেট' (মধ্যপন্থী) ও 'এক্সট্রিমিস্ট' (চবমপন্থী) দের মধ্যে। এর প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের মতামত বুঝিতে দেয় যে তিনি মধ্যপন্থীদের অনুকূলে নন : ''এতকাল পরের দ্বারে আমরা মাথা কুটিয়া মরিবার চর্চা করিয়া আসিয়াছি, স্বদেশসেবাব চর্চা করি নাই—''। এই রবীন্দ্রনাথ ১৯০৪ সালে যে সভায় 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধ পাঠ করেন তাতে বিপিনচন্দ্র পাল বলেন, ''গত ২৫ বৎসর যাবৎ দেশে যে সাধনা চলিতেছে ববীন্দ্রবাবুর প্রবন্ধ তাহারই ফল।.... জাতীয় উন্নতি এখন আর পরকীয দান দ্বারা ঘটিবে না, স্বকীয় সাধনা দ্বারা অর্জন করিতে হইবে। বিলাতে রাজা প্রজার প্রতিনিধি, এখানে তাহা নহে।... যাহাতে আমরা নিজের

পায়ের উপব নিজেরা দাঁড়াইতে পারি, তাহারই চেষ্টা করা কর্তব্য। রবীন্দ্রবাবু জাতীয় জীবনের যে নূতন আদর্শ দেখাইয়াছেন তাহাই আমাদের পক্ষে একান্ত অবলম্বনীয়।" এব প্রায় এক দশকের ব্যবধানে সেই বিপিনচন্দ্র সম্পর্কে ২.৮.১৯১৪ তারিখে প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত চিঠিতে ববীন্দ্রনাথ লিখছেন, "অনেকদিন পর্যন্ত এরা বিনা বাধায় আমাদের দেশের যুবকদের বুদ্ধিকে পঙ্কিল করে তুলছিল। .... দেশের কোন জায়গা থেকে কি এরা ধাক্কা পাবে না? সরল মূঢ়তাকে সওয়া যায় কিন্তু বাঁকা বুদ্ধিকে প্রশ্রয় দেওয়া কিছু না।"[৬] 'বাঁকা বুদ্ধি' হচ্ছে ২৫ মে ১৯০৭ তারিখের বক্তৃতায় একশো এক জ্যান্ত সাদা ছাগল মা কালীকে উৎসর্গ বা আহুতি দেবাব জন্য যুবসমাজকে আহ্বান করা। রবীন্দ্রনাথের সরল স্বদেশী আবেগকে পায়ে মাড়িয়ে যে 'বাঁকা বুদ্ধি' পথ কেটে নিচ্ছিল 'যুগান্তর' পত্রিকা দপ্তর তল্লাশি (৭.৮.১৯০৭), অন্যতম সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে গ্রেপ্তার (২৪.৭.১৯০৭), 'বন্দেমাতরম' সম্পাদক অরবিন্দ ঘোষকে গ্রেপ্তার (১৭.৮.১৯০৭), বিপিনচন্দ্র পালকে ছয মাসেব কাবাদণ্ডদান (১০.৯.১৯০৭), বিডন স্কোয়ার এবং চিৎপুব রোডে উপর্যুপরি দু'দিন (২ ও ৩ অক্টোবর ১৯০৭) পুলিশ ও জনতার খণ্ডযুদ্ধ এবং চব্বিশ পরগণার চিংড়িপোতায় স্টেশন মাস্টারের অফিসে স্বদেশী ডাকাতির মধ্যবর্তিতায় স্বদেশী আর প্রতিবাদী বয়কটে সীমিত থাকল না — রূপ নিল প্রতিবোধী সন্ত্রাসে। পরবর্তী বছরগুলোর 'স্বদেশী ডাকাতি'র খতিয়ান নিলেই এই পরিবর্তনের প্রকৃতি বোঝা যাবে। ১৯০৮ সালে শিবপুর (৩ এপ্রিল), বড়া (২ জুন), বাঘাটি (১৫ আগস্ট), ইংলিশবাজার (১৭ সেপ্টেম্বর), নদিয়ার রায়তা (২৯ নভেম্বর), হুগলির মোরেহাল (২ ডিসেম্বর)-স্বদেশী ডাকাতির সংখ্যা সাত। ১৯০৯-এ তা বেড়ে হয় নয়। হুগলির মুণ্ডপুর (২৭ ফেব্রুয়ারি), যশোরের গাদগাছি (৪ এপ্রিল), চব্বিশ পবগনার নেত্রা (২৪ এপ্রিল), নদিয়ার মহারাজপুর (২৭ জুলাই), খুলনার বাংলা (১৭ আগস্ট), ঢাকার নরেন্দ্রপুরে চলন্ত ট্রেনে (১১ অক্টোবর), ফরিদপুরের দরিয়াপুর (১৫ অক্টোবর), নদিযাব হলুদবাড়ি (২৭ অক্টোবর), ঢাকার রাজনগর (১০ নভেম্বর), পূর্ববঙ্গেব টিপ্পেবার মোহনপুরে (১১ ডিসেম্বর), যশোরের বুইকারা (২৬ ডিসেম্বব)। এই স্বদেশী ডাকাতি এবং পুলিশ খুন করা, চর সন্দেহে গুমখুন ইত্যাদি অনিযন্ত্রিত সন্ত্রাসপন্থা হয়ে যায় 'স্বদেশী'র নামান্তব। ১৯১৫তে যখন 'ঘরে-বাইরে' লেখা শুরু হচ্ছে, সেই বছব স্বদেশী ডাকাতির সংখ্যা দাঁড়ায় পঁচিশ। অন্যদিকে স্বদেশীর সৃজনশীল ও উৎপাদনমুখী প্রবণতার প্রতি আকর্ষণে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশীযুগে 'হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সুরেন্স সোসাইটি' ও সুতি কাপড়ের দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎপাদক কুষ্টিয়ার 'মোহিনী মিল' এর অন্যতম পরিচালক।[৭] স্বভাবতই বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা কবলেও তার প্রতিকাবের জন্য সন্ত্রাস, হত্যা এবং বোমাবাজির সমর্থক হওয়া সেদিন বহু মানুষের মতো রবীন্দ্রনাথেব পক্ষেও সম্ভব হয়নি। ১৯০৫-এর ভাবাবেগ তাই বর্জিত ১৯১৫-১৬'র ঘরে-বাইরে'তে। 'ঘরে-বাইরে' পড়তে গিযে তাই স্বদেশী-বয়কট-সন্ত্রাসের পর্ব-পর্বান্তর-পর্বভেদ সম্পর্কে অবহিত থাকতে হবে। তাহলেই আমাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব হবে 'ধাত্রীদেবতা'ব শিবনাথ চোখের সামনে রাজনৈতিক খুন দেখে কেন বিমর্ষ হয়, কেন 'ধুলোমাটি'র শিবু সন্ত্রাসবাদে যৌবন পুড়িযে 'মানুষ' হযে বাঁচতে চেয়ে শূন্যতার প্রতিশব্দ ছাড়া কিছু পায় না, কেন 'এভাবেই এগোয়'-এর মিনুব দুপুরগুলো ভার হয়ে চেপে বসে মাথায় এবং সর্বসত্তায়।

## ।। উল্লেখপঞ্জি ।।

১ । সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, 'রাজনীতির অভিধান' আনন্দ, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৭, পৃঃ ৩১০

২ । 'রাজনীতির অভিধান', প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৫

৩ । হেমচন্দ্র কানুনগো, 'বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা, চিরায়ত, দ্বিতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ১৯৯৭, পৃঃ ৩৯

৪ । প্রকাশক : স্টুডেন্টস লাইব্রেরি, ৭৯ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা -৯

৫ । কৃষ্ণ ধর, 'ভারতের মুক্তিসংগ্রামে বাংলা', 'তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, প. ব. সরকার', ১৯৯৭, পৃঃ ৬০

৬ । চিঠিপত্র ৫, পত্রসংখ্যা ২৯

৭ । চিত্তব্রত পালিত, 'বাঙালির ব্যবসা-বাণিজ্য', দৈনিক স্টেটসম্যান ২৮.১০.২০০৭ ও ২৫.১১.২০০৭, পৃঃ ৪ । মোহিনী মিলের পরিচালকমণ্ডলীর অন্য সদস্যরা হলেন মোহিনীমোহন চক্রবর্তী, চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়, মাধবচন্দ্র রায়, রাজা প্রমথনাথ দেব ও মহারাজ জগৎকিশোর আচার্যচৌধুরী । হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সুরেন্স সোসাইটির পরিচালকমণ্ডলীর অন্য সদস্যরা হলেন ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীশচন্দ্র রায় ।

---

প্রবন্ধটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ'-এর পরিচালনায় 'একালের প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠ / ব্যক্তিজীবন ও স্রষ্টাজীবন' শীর্ষক উজ্জীবনী পাঠমালায় ১২.৩ ২০০৮ উপস্থাপিত হয় । প্রথম মুদ্রণ ৩১ ৩ ২০০৯ ।

# ঘরে-বাইরে : 'বয়কট ও স্বদেশী' বনাম 'স্বদেশী সন্ত্রাস' এবং অভিজাত বাঙালির গার্হস্থ্য রণরঙ্গ

''রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধি বাকী কোন দিকে? তিনি এখন পূর্ণ সার। অর্থের সম্মানের অবধি নাই। দেশহিত করিতে যাইয়া তাঁহাকে এক পশুপতিনাথ বসুর বাড়ীর সভায় ব্যতীত অন্য কুত্রাপি হতাশ হইতে হয় নাই। বিধির বাঁধন রাখতে গিয়ে তাঁকে জেলে যেতে হয় নাই। এমনকি বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে দিয়ে একলাও চলতে হয় নাই। বরং নানা কারণে তিনি সারত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। তা সে ঋণ শোধ করিতে গিয়া তিনি ১৩২২ সালে ১৩১২ সনের ঝাল মিটাইলেন কেন? ... তিনি পরস্ত্রী মজাইবার একটা চিত্র আঁকিয়া দিলেন। ঘরে বাইরের উপসংহারে তিনি স্বদেশীর সর্বকার্যই দোষদুষ্ট বলিয়া বাহবা লইয়াছেন।''[১] এই ধরনের সমালোচনার অঙ্কুশে বিদ্ধ ও জর্জবিত হলেও রবীন্দ্রনাথ কিন্তু খুব সহিষ্ণু উত্তর দিয়েছিলেন অন্যান্য কিছু মৃদুতর সমালোচনাকে উপলক্ষ করে। সেইসব সমালোচনার উত্তরগুলো 'ঘরে বাইরে'র পাঠকদের অজ্ঞাত নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উত্তরেই এর নিষ্পত্তি হয়ে যায়নি। বরং বিগত প্রায় একশো বছরে নানামুখী ঢেউয়ের ঝাপটা খেয়েও তাঁর লেখালেখিব সাবগ্রাহী মূল্য থেকে যাওয়ায় একদল একনিষ্ঠ কীর্তনিয়া রবীন্দ্র সাহিত্যে লেখকের ব্যক্তিগত শ্রেণিস্বার্থভাবিত ও প্রাণিত বাচনসম্ভারকেও কথামৃতের পর্যায়ে প্রক্ষেপণ করে তা সাহিত্য আগ্রহীদের গলাধঃকরণ করাতে চান। এই আপত্তিকর কবিরাজীর আপত্তি হওয়া উচিত। এখানে 'ঘরে-বাইরে' প্রসঙ্গে তার চেষ্টা করা হবে।

লেখক জানাচ্ছেন যে, ''.... যে কালে লেখক জন্মগ্রহণ করেছে সেই কালটি লেখকের ভিতর দিয়ে হয়তো আপন উদ্দেশ্য ফুটিয়ে তুলেছে।......... লেখকের কাল লেখকের চিত্তের মধ্যে গোচর ও অগোচরে কাজ করছে।...... আমাদের দেশের আধুনিক কাল গোপনে লেখকের মনে যে সব রেখাপাত করেছে ঘরে-বাইরে গল্পের মধ্যে তার ছাপ পড়ছে।..... ঘরে-বাইরে গল্প যখন লেখা যাচ্ছে তখন তার সঙ্গে সঙ্গে লেখকের সাময়িক অভিজ্ঞতা জড়িত হয়ে পড়েছে এবং লেখকের ভালো-মন্দ লাগাটাও বোনা হয়ে যাচ্ছে ........।''[২] আমাদের কথা হচ্ছে, লেখক রবীন্দ্রনাথের 'ভালো-মন্দ-লাগাটা' যদি তাঁর সৃজনশিল্পের ক্ষেত্রে অত্যজ্য উপকরণ হতে পারে (এবং তা হওয়া উচিতও), তাহলে সমালোচক বা পাঠকের মতামতে অসহিষ্ণু হবারও তো কারণ থাকে না; অথচ তেমনটা রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে ঘটে গিয়েছিল। এমনকি পরবর্তীকালে তাঁকে 'ঠাকুর' বানিয়ে সমকালেব হিন্দু-বাঙালির আর এক ঠাকুরের

শিষ্যদেব মতো রবীন্দ্রভক্তদের একটা বিশেষ শ্রেণি এখনও তাঁর সাহিত্য-সলিলের সবকিছুকেই পদ্মপুকুর বানানোর চেষ্টায় পবমহংসের মতো প্রতিনিয়তই রবীন্দ্র-শান্তিবারি ছেটানোর কাজে ক্লান্তিহীন!

রবীন্দ্রনাথেব জীবনকালেই বাঙালি সাহিত্যজীবিদের একাংশ তাঁর প্রভাবসঞ্চারী 'নেশা'য় এতটাই আচ্ছন্ন হয়েছিলেন ('সে-নেশা আমাদের বিচারবুদ্ধিকে ঘুম পাড়াতে পারে না'-বুদ্ধদেব বসু[৩]) যে তাঁর 'ঐশ্বর্যের ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে দিশেহারা'[৪] হয়ে অজস্র ভাবাবেগ উচ্ছ্বসিত ওঙ্কাবধ্বনি লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন। এইসব প্রণবধ্বনির সঙ্গে পাঠকদের অনেকেরই পরিচয় আছে নিশ্চয়ই। তবুও তেমন কয়েকটাকে আউড়ে নিযে আমরা আমাদের 'ঘবে-বাইরে' সংক্রান্ত বক্তব্যে প্রবেশ করব।

বুদ্ধদেব বসুর মতো রবীন্দ্রনাথের হিসেবী একলব্য শিষ্যের মন্তব্য দিয়েই আমাদের এই উৎকলন সূচিত হোক : "ঘবে-বাইরে'তে অলংকাবের ভান্ডার উজোড করে ঢেলে দেয়া হ'লো—চলতে-ফিবতে পায়ে মুক্তো ঠেকে, হাত নাড়ালেই হীরের ফল ঝ'বে পড়ে।.....'ঘবে-বাইরে'ই চলতি ভাষায় তাঁর প্রথম উপন্যাস, তাই এতে কিছুটা আত্ম-সচেতনতা অনিবার্য হয়েছিলো। পাছে এই ভাষাকে কেউ আটপৌরে ব'লে অবজ্ঞা করে, এ-রকম একটা আশঙ্কাও হয়তো কাজ করেছে তাঁর মনে; তাই তিনি একে নিযে গেলেন একেবারে সমারোহের উচ্চ শিখরে।.... ..যে-মুক্তিকে অনেকদিন ধরে মনে-মনে কামনা করা গেছে, তাকে প্রথম লাভ করার আনন্দেই এর মধ্যে দেখা দিয়েছে পুনরুক্তি-বহুল 'স্বপ্নমদিব নেশায় মেশা উন্মত্ততা'।[৫]

অকারণ-পুলকে প্রথম বসন্ত-বাতাসের স্পর্শশিঞ্জনের মতো অনুভূতি নিয়ে জগতের সবকিছুকে দেখা-বোঝা-ভাবার মধ্যে এক ধরনের তৃপ্তি আছে। পিত্ত ভারসাম্য রক্ষাব উপকার সুনিশ্চিত এই মনোভঙ্গিতে। বিশ্বপতি চৌধুরী মহাশয়ের 'ঘরে-বাইরে' বিশ্লেষণে আমরা তেমন পুলকিতচিত্ত উৎফুল্ল ব্যক্তিক আবেশ অনুভব করি। তাঁর মতে "ঘরে-বাইরে' যে আমাদের ভালো লাগে, সে চরিত্র বিশ্লেষণের নৈপুণ্যের জন্য নয়, ঘটনাবিন্যাসের কৌশলের জন্য নয়, সে কেবল তার বুদ্ধিদীপ্ত, যুক্তিধর্মী, সুতীক্ষ্ম শাণিত অথচ উচ্ছ্বাসময়, আবেগময় অপূর্ব্ব প্রকাশভঙ্গির জন্য। এই পুস্তকখানিব ভিতর দিয়া মানব জীবন ততটা রূপায়িত হইয়া ওঠে নাই, যতটা রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে কয়েকটি গভীর সূক্ষ্ম সত্য এবং গভীর চিন্তা। এই সত্য এবং চিন্তাগুলিকে বুদ্ধিদীপ্ত, যুক্তিপূর্ণ, শাণিত, সতেজ ভাষার সাহায্যে রূপায়িত করিবার জন্য লেখক তাঁহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ কবিয়াছেন, এবং তাহার ফলে ঔপন্যাসিক-বাস্তবতার পরিবেশ সর্ব্বত্র অক্ষুন্ন থাকে নাই জানিয়াও তিনি এতটুকু চিন্তিত নন।"[৬] পাঠক, বুঝুন; (!) উপন্যাসের বাস্তবতা নেই জেনেও রবীন্দ্রবৃক্ষের শ্রীফল, তাই তা অমৃতজ্ঞানে ভক্ষণ করতে হবে! দেশের লোকের যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে প্রেমমুগ্ধা বিদেশিনী ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোকে আপনি অভিযুক্ত করবেন কি বলে, যখন তিনি রমাঁ রলাঁ'র "Inde:Journal" (ভারতবর্ষ, দিনপঞ্জি-১৯১৫-১৯৪৩)-এ ঘরে বাইবে সম্পর্কিত একটা নিরীহ সত্যবিবৃতিকে নস্যাৎ করে লেখেন, "ঘরে-বাইরের মূল্য কখনো নষ্ট হয় না, রুশদেশের

জারশাসন লুপ্ত হয়ে গেলেও যুদ্ধ ও শান্তি উপন্যাসের মূল্য কমে না। অল্পবয়সীরা কিছুদিনের জন্য একটি মহৎ উপন্যাসকে উপেক্ষা করতেও পারে। কিন্তু আরেক প্রজন্ম এসে তাকে নতুন করে আবিষ্কার করে নেবে, পুরোনো তরুণেরা ততদিনে কবরে।"[৭] রবীন্দ্রনাথ ও 'ঘরে বাইবে' সম্পর্কে রমাঁ বলাঁর মন্তব্যটি ছিল, "গান্ধী তাঁর কাছ থেকে শুধুমাত্র সমস্ত প্রাণশক্তি কেড়ে নেননি, তাঁর মহৎ উপন্যাসগুলো প্রাচীন হয়ে গেছে। ঘরে বাইরের মতো বইয়ের মধ্যে আজকের ভারতবর্ষ আর নিজেকে খুঁজে পায় না। এ যে সামাজিক অবস্থা নিয়ে লেখা তা ইতিমধ্যেই অতীতের বস্তু হয়ে গেছে। তাবপর থেকে রবীন্দ্রনাথের পর্যবেক্ষণ নবীকরণ হয়নি।"[৮] অন্তর্লীন গান্ধীবাদের অভিযোগ তো নতুন নয় রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে। বিদেশিদের পরিভাষায় তা গান্ধীবাদ শব্দে চিহ্নিত হলেও এ বস্তুত শিল্পায়ন বিমুখতা। ধনবাদের ইস্পাত লোহার কাঠিন্যের পথে পা না দিয়ে দূষিত মৃত্তিকায় পদচারণার মাধ্যমে সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার বায়ুভূক হাস্যকর প্রয়াস। 'স্বদেশি'-'আত্মনির্ভরতা'-'গ্রাম স্বরাজ'-'দেশজ-কুটিরশিল্প' ইত্যাদি গালভরা বুলির আশ্রয়ে খণ্ডিত বাংলায় একজন সমাজতন্ত্রী বিপ্লবমূলক ব্যাঙ্ক ডাকাতি থেকে 'আমার কুটির' এর প্রান্তিক চর্মশৌখিন দ্রব্য উৎপাদনের ওয়ার্কশপ আশ্রয় করে বার্ধক্য কাটিয়ে গেছেন। আর এক অশীতিপর অর্থনীতিবোদ্ধা শতকোটি মানুষের ভরণপোষণের সমস্যাকে উপজীব্য করে সমাধান-পথ হিসেবে গো পালন-গোবর উৎপাদন-গোবর থেকে ধূপকাঠি প্রস্তুতকরণ-বিক্রয়—এই কুম্ভীপাকে *অম্লান*-কলমে প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখেছেন গান্ধী এবং রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশী সমাজ' আশ্রয়ে। স্বভাবতই স্থূলেমূলে রবীন্দ্রনাথকে নয়, তাঁর এই অর্থনৈতিক মতবাদকে (নিখিলেশ যার প্রতিভূ-কথক ও ভাবুক 'ঘরে-বাইরে'তে) আক্রমণ করে রমাঁ রলাঁ কিছু অন্যায় বা অসঙ্গত সমালোচনা কবেছিলেন বলে তো মনে হয় না। ১৯২২ সালে জর্জ লুকাচের 'Reviews and Articles' গ্রন্থভুক্ত "রবীন্দ্রনাথের গান্ধীবাদী উপন্যাস : ঘরে বাইরে" প্রবন্ধটি অনেক বেশী তীক্ষ্ম এবং অব্যর্থ লক্ষ্যবেধীও বটে : "তাঁর বিস্বাদ সৃষ্টিগুলিতে উপনিষদ ও ভগবদ্‌গীতার গুঁড়ো মশলা ছড়িয়ে তিনি টিঁকে আছেন।..... রবীন্দ্রনাথকে খ্যাতি ও অর্থ (নোবেল পুরস্কার) দিয়ে পুরস্কৃত করার পেছনে ইংরেজদের নিজস্ব স্বার্থ কাজ করছে। **এইভাবে তারা ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরুদ্ধে তাদের সাংস্কৃতিক দালালকে পুরস্কৃত করছে।** সুতরাং ব্রিটেনের কাছে অতীতের ভারতবর্ষের 'জ্ঞানের' এই ভুক্তাবশিষ্টের, সম্পূর্ণ নীরব বশ্যতা ও হিংসাত্মক পথেব কুফল সম্পর্কিত মতবাদের সুনির্দিষ্ট ও স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান তাৎপর্য আছে, অবশ্য যখন শুধুমাত্র ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রসঙ্গেই এই প্রশ্নগুলি উত্থাপিত হয়। রবীন্দ্রনাথের বিপুল খ্যাতি ও প্রভাব, অধিকতর কার্যকরীভাবে তাঁর প্রচার পুস্তিকাগুলি তাঁর স্বদেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হতে পারে।

'কেননা, ক্লান্তিময় একঘেয়েমি ও অন্তঃসার-শূন্যতা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসটি প্রচার-পুস্তিকা ছাড়া আর কিছুই নয় এবং কুৎসা বর্ণনার নিম্নতম স্তরে নেমে গেলেই এই ঘটনা ঘটতে পারে। কুৎসাগুলি যতবেশী পরিমাণে আবেগপূর্ণ 'জ্ঞানে' সিক্ত হয়ে পরিবেশিত হয়, 'বিশ্বজনীন মানবতার' 'নিগূঢ়' দর্শনের আবরণে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি তাঁর নিস্ফল ঘৃণা রবীন্দ্রনাথ

যত বেশি ধূর্ততার সঙ্গে গোপন করার চেষ্টা করেন, একজন নিরপেক্ষ পাঠককে এই ধরনের কুৎসা রটনা তত বেশী বীতরাগ করে তোলে।

'বৌদ্ধিক স্তরে উপন্যাসটির সংঘর্ষ হিংসা ব্যবহারের প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা পর্বটি লেখক এখানে চিত্রিত করেছেন; ব্রিটিশ দ্রব্য বয়কটের সংগ্রাম, ভারতীয় বাজার থেকে ব্রিটিশ দ্রব্য হটিয়ে দিয়ে তার জায়গায় ভারতীয় দ্রব্য চালু করার সংগ্রাম এই উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে। এবং রবীন্দ্রনাথ এই সুগভীর প্রশ্নটি উত্থাপিত করেছেন : এই সংগ্রামে হিংসার ব্যবহার কি নৈতিকভাবে সমর্থনীয়? এক্ষেত্রে পরিপ্রেক্ষিতটি হচ্ছে শৃঙ্খলিত পরাধীন ভারতবর্ষ; কিন্তু এই প্রশ্নটির প্রতি রবীন্দ্রনাথ বিন্দুমাত্র উৎসাহ দেখাননি। আসলে তিনি ত' একজন দার্শনিক, 'শাশ্বত সত্যগুলি' সম্পর্কে ভাবনায় বিভোর একজন নীতিবাদী'! হিংসার ব্যবহার ইংরেজদের আত্মিক জগতে যে ক্ষতিসাধন কবেছে, সে সম্পর্কে তাদের ইচ্ছানুযায়ী এবং তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে তারা বোঝাপড়া করে নিক্; **রবীন্দ্রনাথের কর্তব্য হচ্ছে**, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে হিংসা, প্রবঞ্চনা ইত্যাদি ভারতীয়দের যে ক্ষতিসাধন করছে, **আত্মিকভাবে ভারতীয়দের তার হাত থেকে উদ্ধার করা এবং তাদের আত্মাকে সুরক্ষিত রাখা**। তিনি লিখেছেন ঃ '*সত্যের জন্য যারা প্রাণ দেয় তারা অমর হয়ে থাকে; এবং যদি একটি পুরো জাতি সত্যের জন্য প্রাণ দেয় তা হলে মানবসভ্যতার ইতিহাসে এই জাতিটি অমর হয়ে থাকবে।*'

'এই দৃষ্টিভঙ্গী ভারতবর্ষকে **চিরকালের জন্য পরাধীন করে রাখার মতবাদের** প্রতিনিধি; কিন্তু তাঁর এই উপন্যাসের চরিত্র ও ঘটনাবলীর ভেতর দিয়ে এই মতবাদকে তিনি যেভাবে ব্যক্ত করেছেন, তাতে রবীন্দ্রনাথের এই দৃষ্টিভঙ্গী প্রকটতরভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে। তিনি যে আন্দোলনটি চিত্রিত করেছেন সেটি হচ্ছে বুদ্ধিজীবিদের রোমান্টিক আন্দোলন।...... রোমান্টিক ইউরোপীয় চিন্তা, আদর্শনৈতিক অতিরঞ্জন এবং ধর্মযুদ্ধসুলভ মানসিকতা হচ্ছে এই ধরনের আন্দোলনের মৌলিক চরিত্র। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কুৎসামূলক প্রচার পুস্তিকাটির এটি হচ্ছে সূচনা-বিন্দু। যে ধর্মযুদ্ধসুলভ রোমান্টিকতার আদর্শ প্রতিভূদের বিশুদ্ধতা আদর্শ ও আত্মদানের মানসিকতা প্রশ্নাতীতভাবে পরিচালিত করেছিল, সেই রোমান্টিকতাকে তিনি উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা ও অপরাধপূর্ণ জীবনে রূপান্তরিত করেন। এই মতবাদের প্রবক্তা তাঁর নায়ক হচ্ছেন একজন ছোটগোছের ভারতীয় অভিজাত, অন্তর ও বাহির-উভয় দিক থেকেই তাঁর জীবনকে একটি 'দেশপ্রেমিক' অপরাধী গোষ্ঠীর হিংস্র অমিতাচার ধ্বংস করে দেয়। তার গৃহ ধ্বংস হয়ে যায়। তিনি স্বয়ং এমন একটি যুদ্ধে পরাজিত হন, দেশপ্রেমিকদের বিবেকহীনতা যার দাবানল প্রজ্বলিত করেছিল। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য অনুযায়ী, আমাদের এই নায়কটি কোনমতেই জাতীয় আন্দোলনের শত্রু ছিলেন না; বরঞ্চ তিনি জাতীয় শিল্পের বিকাশে সচেষ্ট হয়েছিলেন; জাতীয় শিল্প সম্পর্কে তিনি নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। অবশ্য একমাত্র এই শর্তে যে এতে তাঁর কোন অর্থ ব্যয় হবে না। তিনি একজন দেশপ্রেমিক নেতাকে আশ্রয় দেন, যিনি ছিলেন গান্ধীর একজন ঘৃণ্য পরিহাস। কিন্তু পরিস্থিতি যখন তাঁর পক্ষে বেশী কঠিন হয়ে পড়ে, তখন তিনি তাঁর

নিজস্ব ও ইংরেজ পুলিশদের ক্ষমতার হাতিয়ারগুলির সহায়তায় 'দেশপ্রেমিকদের' হিংসায় ক্ষতিগ্রস্ত সবাইকে আশ্রয় দেন।

'এই প্রচাবমূলক, আত্মম্ভরী রাজনৈতিক নেতাদের মতন একপেশে দৃষ্টিভঙ্গী শৈল্পিক বিচারের মানদণ্ডে উপন্যাসটিকে একেবারে মূল্যহীন করে দিয়েছে। নায়কের বিরোধীপক্ষ কোন প্রকৃত, বাস্তব মানুষ নয়-তিনি হচ্ছেন একজন ফট্কাবাজ যিনি, দৃষ্টান্তস্বরূপ, নায়কের স্ত্রীর কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ হাতিয়ে নিযে এবং নায়কের স্ত্রীকে চৌর্যবৃত্তিতে বাধ্য করে সেই অর্থ জাতীয় সংগ্রামের স্বার্থে ব্যয় করেন না, বরঞ্চ চকচকে স্বর্ণ অলঙ্কারগুলির দিকে লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। স্বাভাবিকভাবেই যে সব নারীপুরুষকে তিনি ভুল পথে টেনে নিয়ে আসেন, তাদের সামনে তাব আসল চরিত্র উদ্ঘাটিত হওযামাত্র তারা ঘৃণাভরে তাকে প্রত্যাখ্যান করে।

'কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সৃজনীক্ষমতা একটি সার্থক প্রচার-পুস্তিকা সৃষ্টি করতেও সক্ষম হয না।...... যে ভারতীয় জ্ঞানের পিণ্ডের সঙ্গে জড়িত করে গল্পটি পবিবেশিত হয়েছে, তার থেকে তাঁর বিষযবস্তুকে বিচ্ছিন্ন করলে গল্পটির 'আধ্যাত্মিক' দিকটি অত্যন্ত হাল্কা ধরনের পেটি-বুর্জোযা জটাজাল ছাড়া আর কিছুই দাঁডায় না। অন্তিমে 'পবিবাবের কর্তার' মানমর্যাদাব 'সমস্যাটিই' মূল প্রশ্ন হযে দাঁড়ায়, উপন্যাসটিব মূল বিষয়বস্তু যা দাঁড়ায়, তা হল, কিভাবে 'ভাল ও সৎ' মানুষেব স্ত্রীকে একটি রোমান্টিক ফট্কাবাজ ভুল বুঝিয়ে কু-পথে নিয়ে গিয়েছিল এবং কিভাবে পরে নিজ ভুল বুঝতে পেরে অনুশোচনাদগ্ধ স্ত্রীটি তার স্বামীর কাছে প্রত্যাবর্তন করে।..... বিশুদ্ধ তত্ত্বের শূন্যতার ভেতরে (এবং সুরম্য অট্টালিকার চার দেওয়ালের অভ্যন্তরে) 'স্বতন্ত্রভাবে' জ্ঞানের মূল্যায়ন খুবই কঠিন। কিন্তু যখনই মানবজীবনের পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করার দাবী নিযে তা বাইরে চলে আসে, সেই মুহূর্তে তার স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়ে যায়। এই উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ এই দাবী নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছেন। এবং আমরা দেখেছি, ব্রিটিশ পুলিশের বৌদ্ধিক সেবায় তাঁব 'বুদ্ধি' ব্যবহৃত হযেছে। অতএব এই 'জ্ঞানের' অবশিষ্টাংশের প্রতি তীক্ষ্ণতর নজর দেওয়ার আর কোন প্রয়োজনীয়তা আছে কি?[৯]

প্রায় সব দিক থেকে 'ঘরে-বাইরে'ব সৃষ্টি এবং স্রষ্টাকে এমন বাক্যভেদী বাণে বিপর্যস্ত করাব সাহস একমাত্র সমকালের বিরূপ অরসিক বাঙালির পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল। ক্রমে আখ্যানের পরিপ্রেক্ষিত যত ঝাপসা হতে থাকছে, বিশ্লেষণ-মূল্যায়ন-সমালোচনাও নিত্যপূজার ঔপচারিকতায পর্যবসিত হয়েছে। যদিও এর মধ্যেও কেউ কেউ বেশ মধুলেপিত সরেস-কাঠির খোঁচা মারায পারদর্শিতা দেখিযেছিলেন। কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তেব পিতা হীরেন্দ্রনাথ দত্ত তেমন একজন। 'ঘবে-বাইরে' সম্পর্কে তিনি লেখেন : 'সবচেয়ে হাস্যকর এই যে বহির্জগতের প্রথম পুরুষটিব সংস্পর্শমাত্রই (বিমলার) পাতিব্রত্যে ফাটল দেখা দিল। ..... জীবনে অনেক কিছু ঘটে-সমাজ যাকে মানতে চায না। যিনি আর্টিস্ট তিনি মনে মনে জানেন যে সমাজের চাইতে জীবনের দাবি বড়। রবীন্দ্রনাথ মনে যা জেনেছেন লেখনীব মুখে তা স্বীকাব করতে পারেননি। জীবনের দাবিকে তিনি এড়িয়ে গিয়েছেন। .....আপন সৃষ্ট চরিত্র থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে এনে সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক ভাব অবলম্বন করা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অনেক সময়েই সম্ভব হয়নি।"[১০]

।। ২।।

বস্তুতপক্ষে 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের ঔপন্যাসিক অভিসন্ধিকে যথাযথ উপলব্ধি করার জন্য এব আখ্যানের পরিপ্রেক্ষিতটাকেই বেশী করে বুঝতে হবে। ১৯১৫ সালের এপ্রিল থেকে ১৯১৬ সালের ফেব্রুয়াবি (বৈশাখ-ফাল্গুন ১৩২২) পর্যন্ত 'সবুজপত্র' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয় উপন্যাসটি। প্রকাশকাল পর্বেই ১৯১৫ সালের ৩ জুন তাঁকে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সবকার 'স্যার' উপাধিতে ভূষিত করে। মাত্র তের বছব বয়সে যিনি ১৮৭৪ সালে 'হিন্দু মেলা'য় গিয়ে 'হিন্দু মেলার উপহার' প্রবন্ধ পাঠ করেন, ১৮৭৭ সালেও কবিতা পাঠ করেন একই আসরে, যিনি ছিলেন 'স্বাদেশিক সভা'ব একজন সক্রিয় সদস্য (প্রতিষ্ঠাতা রাজনারায়ণ বসু ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুব), ১৮৯৩ সালে চৈতন্য লাইব্রেবীতে যিনি 'ইংবেজ ও ভাবতবাসী' প্রবন্ধ পাঠ করেন, যিনি ১৮৯৬ সালে কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্'-এ সুর-আরোপ করে গান কবেন, যিনি ১৮৯৭ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্সে যোগ দেন, তিলকেব গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে প্রবন্ধ লেখেন এবং মামলার ব্যয় চালানোর জন্য অর্থসাহায্য করেন ও টাউন হলে 'কণ্ঠরোধ' প্রবন্ধ পাঠ করেন; তাঁকেই ১৯১৬ সালে স্বদেশীদের দ্বারা নিন্দিত হতে হচ্ছে! ১৯১৫ সালে তিনিই যে ব্রিটিশদের দ্বারা পুরস্কৃত হয়েছেন! এই বৈপরীত্য-সমাপতনের রসায়ন না উদঘাটন করে 'ঘরে-বাইরে'র রহস্যভেদ সম্ভব নয়।

বঙ্গভঙ্গকে (১৬ অক্টোবর ১৯০৫) কেন্দ্র করে বাংলাদেশে জাতীয় আন্দোলনের জোযাব উঠে আসে। ''যেহেতু, জাতীয় আন্দোলন বাংলাদেশেই শুরু হয়, সেই আন্দোলন প্রতিরোধের জন্য সরকারি বাধা চরমে ওঠে। স্বদেশী শিল্পকে বয়কটের অপর রূপ মনে করে, সরকার অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে। তাই বাঙালি উদ্যোক্তাদের রাজনীতিতেও নামতে হয়। বঙ্গের জাতীয় বণিকসভা তাঁদের প্রধান রাজনৈতিক মঞ্চ হয়ে ওঠে। এক নতুন অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়। বিশ শতকের শুরুতে জাতীয় বণিকসভা ভারতীয় ব্যবসায়ীর যথার্থ মুখপাত্র হয়ে উঠেছিল। বৈধ ছাড়ের জন্য এবং শিল্পোদ্যোগে সহাযতার জন্য সরকারের সঙ্গে বণিকসভার নিত্য ওঠাবসা ছিল। ইউরোপীয় শিল্পায়নের অনুসরণে ভারতের জাতীয় শিল্পোদ্যোগের জন্য এবং প্রগতি ও সমৃদ্ধির স্বপক্ষে বক্তব্য উপস্থাপন করাই ছিল এর কাজ। এইসব বক্তব্য এর আগে 'ডন' পত্রিকায় সতীশচন্দ্র মুখার্জ্জী উচ্চারণ করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, নির্বিচারে স্বদেশী শিল্প উচ্ছেদ না করে রেল, খনি এবং রাসাযনিক উৎপাদনের মতো ভারী শিল্পের ক্ষেত্রে পশ্চিমী প্রযুক্তি প্রযোগ করতে হবে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি দেশীয় শিল্প নিজেদেরই গড়েপিটে নিতে হবে। দক্ষিণারঞ্জন ঘোষ তাঁর 'Indian Industrial Guide' গ্রন্থটিতে নবীন শিল্প-উদ্যোগীদের পরামর্শ দিয়েছেন। জাতীয় বণিকসভাও সেই কাজে হাত দিয়েছিলেন। এই ধরনের অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গের পর আরও প্রবল হয়েছিল।

'১৯০৪ এবং ১৯০৫-এর বাৎসরিক প্রতিবেদনেও (জাতীয় বণিকসভার) বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত এবং প্রকৃতি নিয়ে গণউত্তেজনার কথা তুলে ধরা হয়। সর্বশ্রেণির মানুষের মধ্যে যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে তা খুব দুঃখজনক বলে বর্ণনা করা হয়। এই সভা *বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করলেও তার প্রতিকারের জন্য সন্ত্রাস, হত্যা এবং বোমাবাজির নিন্দা করেছিল*। ১৯০৮-০৯ এর প্রতিবেদনে সরকার বিরোধিতার বিরুদ্ধে রায় দেওয়া হয়েছিল। এই বিরোধিতা এতটাই যে, সরকার অপরাধী আইন[১১] বলবৎ করে। এই ব্যাপারে বণিকসভা সরকারের সমর্থন করে। সভাব এই *মনোভাব* হয়তো আজকের পাঠককে অবাক করতে পারে। কিন্তু সেকালে সকলেরই সরকারি সন্ত্রাসের ভয় ছিল এবং ব্যবসায়ীরা এই ব্যাপারে আরও সন্ত্রস্ত ছিল। ব্যবসায়ের স্বার্থে শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি একান্তই কাম্য ছিল। তখনও ব্রিটিশ বিতাড়নের সঙ্কল্প নেওয়া হয়নি। স্বদেশী এবং বয়কট অর্থনৈতিক সঙ্কট মোচনের হাতিয়ার ছিল ঠিকই কিন্তু *বৈপ্লবিক সন্ত্রাস তাঁদের স্বার্থের প্রতিকূল ছিল*। বণিকসভা কোনও রাজনৈতিক সংস্থা ছিল না। স্থানীয ব্যবসায়ীর বাণিজ্যিক স্বার্থে যা কিছু করা প্রয়োজন করত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালেও তাঁরা একই পথ বেছে নিয়েছিলেন। কিন্তু স্বদেশি এবং বয়কট অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে তাঁদের একটুও বাধেনি।'"[১২] রবীন্দ্র উপন্যাসের কালাঙ্ক নির্ণয় করতে চেয়ে অধ্যাপক শুকদেব সিংহ ডঃ নীহারবঞ্জন রায়ের 'রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা' ২য় খণ্ড অবলম্বনে 'ঘরে-বাইরে'র কাল পরিচয় চিহ্নায়নে পূর্ববর্ণিত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাতেব তৎকালীন দ্বান্দ্বিক বোঝাপড়ার কার্যকারণটিকেই সত্যার্থরূপেই ব্যক্ত করেছেন। তাঁর ভাষ্য : "বিশ শতকের বিশেষত কলকাতায় ক্ষমতাসম্পন্ন এক উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণি গ'ড়ে ওঠে। এ শ্রেণির সামাজিক আদর্শের অন্তর্ভুক্ত ছিলো ***ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও দেশোত্তর মানবতা-ধর্ম***। এ আদর্শের সঙ্গে ***সঙ্কীর্ণ দেশাত্মবোধের প্রচন্ড একটা বিরোধ*** বেধেছিলো। সে বিরোধই মূর্ত হয়েছে নিখিলেশ ও সন্দীপের স্বতন্ত্র জীবন-চর্যায়। বলাই বাহুল্য, নিখিলেশ এখানে মনেব দিক থেকে নবোদ্ভুত উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণির।"[১৩]

পাঠক, এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে নিখিলেশের 'মনোভাব' আর রবীন্দ্রনাথের মনোভাব কোন কারণে ওই ১৯০৪ থেকে ১৯১৪ কালপর্যায়ে জাতীয় বণিকসভা এবং বাঙালি উদ্যোগপতিদের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। উল্লেখ থাকে যে স্বদেশী হাওয়ায় এবং বয়কটের ধুয়োয় যে বাঙালি উদ্যোগ শুরু হয় ব্যক্তি নিখিলেশের মতো ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথও তাতে এগিয়েছিলেন। বস্ত্রশিল্প ছিল সর্বপ্রধান। তাতে এক নম্বরে ছিল ১৯০৬-এ শ্রীরামপুরে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, সীতানাথ রায়, রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী, কৃষ্ণচন্দ্র দে এবং উপেন্দ্রনাথ সেনের পরিচালনাধীন 'বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল'। "এর পরেই উল্লেখযোগ্য কুষ্টিয়ার মোহিনী মিলের নাম। জেলা শাসকের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করে মোহিনীমোহন চক্রবর্তী ১৫ লক্ষ টাকার মূলধন সংগ্রহ করে এই মিল খোলেন। এই মিলও স্বদেশীর হাওয়ায় ও বয়কটের ধুয়োয় ভালোই চলতে থাকে। এর পরিচালনমণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন চক্রবর্তী ছাড়া চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়, মাধবচন্দ্র রায়, রাজা প্রমথনাথ দেব, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মহারাজা জগৎকিশোর আচার্যচৌধুরী।"[১৪] বিমা ব্যবসার সঙ্গেও স্বদেশি যুগে রবীন্দ্রনাথের

যুক্ত থাকার কথা জানা যায়। "Hindustan Co-operative Insurance Society" জনপ্রিয় হয়। এর শুরুতে মূলধন ছিল ১ কোটি টাকা। পরিচালনায় যুক্ত ছিলেন ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীশচন্দ্র রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ।"[১৫] নিখিলেশও তো তার স্বদেশীর ফিরিস্তি দিয়েছে এইরকম। তার প্রয়াস বিস্তৃত হয়েছিল অনেক খেজুর গাছের রস নলের সাহায্যে একজায়গায় এনে রস তৈরীতে, ব্যাঙ্ক খোলায়, তাঁতের কল বা ধান ভানার স্বদেশি যন্ত্র তৈরির ব্যর্থ প্রচেষ্টায় নিযুক্ত ব্যক্তিকে 'তার শেষ নিস্ফলতা পর্যন্ত সাহায্য' করা এবং পুরী যাত্রার জাহাজ চালাবার স্বদেশি কোম্পানী গড়তে নেমে 'অনেকগুলি কোম্পানির কাগজ' ডোবানোয়। তারও আগে জাভা মরিশস থেকে আখ আনিয়ে চাষ করানো এবং সরকারি কৃষিপত্রিকা তর্জমা করে জাপানি সিম কিংবা বিদেশী কাপাসের চাষের জন্য উৎসাহিত করার উদ্যোগের কথাও উল্লেখ করতে হবে, যা উপন্যাসের শেষপর্বে তার ষষ্ঠ আত্মকথায় ব্যক্ত হয়েছে। এই নিখিলেশ রবীন্দ্রনাথের মতো প্রায় তাঁর ভাষাতেই স্ত্রী বিমলাকে বলে, "আমি *প্রদীপ-জ্বালাবার হাজার ঝঞ্ঝাট পোয়াতে রাজি আছি*, কিন্তু তাড়াতাড়ি সুবিধের জন্য ঘরে আগুন লাগাতে রাজি নই। ওটা দেখতেই বাহাদুরি, কিন্তু আসলে দুর্বলতার গোঁজা মিলন।" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে পত্রে রবীন্দ্রনাথও লিখেছিলেন, "উন্মাদনায় যোগ দিলে কিয়ৎ পরিমাণে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেই হয়, এবং তাহার পরিণামে অবসাদ ভোগ করতেই হয়। আমি তাই ঠিক করিয়াছি যে, অগ্নিকাণ্ডের আয়োজনে উন্মত্ত না হইয়া যতদিন আয়ু আছে, *আমার এই প্রদীপটিকে জ্বালিয়া পথের ধারে বসিয়া থাকিব*।"[১৬]

।। ৩ ।।

রবীন্দ্রনাথ ১৯০৪ সালে যে সভায় 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন, সেই সভাতে বিপিনচন্দ্র পাল বলেন : "গত ২৫ বৎসর যাবৎ দেশে যে সাধনা চলিতেছে রবীন্দ্রবাবুর প্রবন্ধ তাহারই ফল।..... জাতীয় উন্নতি এখন আর পরকীয় দান দ্বারা ঘটিবে না, স্বকীয় সাধনা দ্বারা অর্জন করিতে হইবে। বিলাতে রাজা প্রজার প্রতিনিধি, এখানে তাহা নহে। ..... যাহাতে আমরা নিজের পায়ের উপর নিজেরা দাঁড়াইতে পারি, তাহারই চেষ্টা করা কর্তব্য। রবীন্দ্রবাবু জাতীয় জীবনের যে নূতন আদর্শ দেখাইয়াছেন তাহাই আমাদের পক্ষে একান্ত অবলম্বনীয়।" অথচ মাত্র এক দশকের মধ্যে ১৯১৪ সালে বিপিনচন্দ্র কথিত '২৫ বৎসর' এর 'সাধক' রবীন্দ্রনাথই প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত পত্রে (২.৮.১৯১৪) সেই বিপিনচন্দ্র সম্পর্কে লেখেন, "অনেকদিন পর্যন্ত এরা বিনাবাধায় আমাদের দেশের যুবকদের বুদ্ধিকে পঙ্কিল করে তুলেছিল.......দেশের কোন জায়গা থেকে কি এরা ধাক্কা পাবে না? সরল মূঢ়তাকে সওয়া যায় কিন্তু বাঁকা বুদ্ধিকে প্রশ্রয় দেওয়া কিছু না।"[১৭] এই বাঁকা বুদ্ধিকে প্রশ্রয় না দেওয়ার মানবিক কাঠিন্য থেকেই তিনি নৈর্ব্যক্তিকতা বিসর্জন দিয়ে উপন্যাসের চরিত্র নির্মাণে সন্দীপকে বাঁকিয়ে দিয়েছেন। নিখিলেশের প্রতিস্পর্ধায় তার সমান্তরাল চরিত্রটা এখানে হয়ে গেল প্রথম থেকেই বক্র এবং খঞ্জ, যা আশ্চর্যরকম ব্যতিক্রম রাবীন্দ্রিক দ্বৈত পুরুষদের থেকে। অন্তত বিহারী, বিনয় বা শ্রীবিলাসের কাছে অন্তঃপাতী সন্দীপকে মেলানো যায় না। দেশকালের কাছে নিজের শ্রেণির স্বার্থ এবং অস্তিত্বের পক্ষপাত করার দায় পালন করার জন্যই সন্দীপের নির্মাণে

রবীন্দ্রনাথের কোন তথাকথিত শৈল্পিক নিরপেক্ষতা কাজ করল না। পাঠক মনে রাখবেন, 'ঘরে-বাইরে'র প্রেক্ষাকাল থেকে রচনাকালের দশ বছরে বাংলাদেশের রাজনৈতিক খবরে স্বদেশী ডাকাতিই ছিল তথাকথিত বিপ্লবী যৌবনের একমাত্র গন্তব্যপথ। এর সঙ্গে ছিল বিলাতী সরকারী কর্মচারী হত্যা ও সাম্প্রদায়িক সঙ্ঘাত। বিপিনচন্দ্রের কারান্তরাল যাওয়ার (১০.৯ ১৯০৭) পর যা লাগামছাড়া হয়ে যায়। ওই বছর ৬ ডিসেম্বর খড়গপুরের কাছে রেললাইনে বোমা বিস্ফোরণে স্যার অ্যান্ড্রু ফ্রেজারের ট্রেন উড়িয়ে দেবার চেষ্টা, চিংড়িপোতা (২৪ পরগণা) স্টেশনে ডাকাতি (৭.১২.১৯০৭), ১৫ ডিসেম্বর বিডন স্কোয়ারে পুলিশকে পাথর ছোঁড়া, ২৩ ডিসেম্বর গোয়ালন্দ স্টেশনে ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বি.সি. অ্যালেনকে হত্যাপ্রয়াসে বিপিনচন্দ্রের আকাঙ্ক্ষিত দেবী কালিকার জন্য জীবন্ত আহূতির সূচনা হয়। ১৯১৫ সালে যখন 'ঘরে-বাইরে' লেখা হচ্ছে, তখনও এই রক্তহোলী খেলা অব্যাহত জোড়া বাংলার নানাপ্রান্তে। এই সমকালীন রাজনীতির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ গ্রাম বাংলার এক অভিজাত দম্পতির কল্পিত গার্হস্থ্য জীবনের নব্য বোধলব্ধ প্রেম-অপ্রেম এবং গার্হস্থ্য জীবনের শরিকী রেষারেষির আখ্যানকে স্থাপন করে তাঁর প্রাতিস্বিক সমাজনীতির উপলব্ধিগুলোকে প্রকাশ করতে চাইলেন। তাতে রাজনীতি তাঁর ব্যক্তিগত পক্ষপাতপূর্ণ ব্যাখ্যানে বেঁকেচুরে গেছে, চরিত্ররা তাঁরই আত্মস্বরূপের বিখণ্ডিত মূর্তি হয়েছে নিঃসন্দেহে, কিন্তু সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসকে যে 'বাস্তব মানুষের জীবন চিত্র'"[১৮] হয়েই রূপ নিতে হবে ; এই সত্যটাও প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।

|| ৪ ||

'বনেদী বংশের মানসম্ভ্রম বিষয় সম্পত্তি' নাকি বিনষ্ট হচ্ছিল নিখিলেশের হাতে। একথা সন্দীপের বড়বৌদির। যদিও প্রত্যক্ষ নয়, বিমলার আত্মকথার বর্ণনা থেকেই এটা জানা যায়। তা রক্ষা করার জন্য নিখিলেশের পাগলামী প্রতিরোধ করতে হবে, বিমলার বর্ণনায় তার বড়জার নাকি এমনই ইচ্ছা। অথচ নিখিলেশ অসংযমী বা অমিতব্যয়ী নয়। মাত্র ত্রিশ বছর বয়সেই তার সুসমঞ্জস ব্যবহার যে কোন কালের বাঙালির কাছেই অনুসরণীয় করে আঁকা হয়েছে। বিমলা কথিত বড়জার বিরক্তি আসলে উচ্চবিত্ত বাঙালি গৃহের অত্যজ্য অস্মিতার ফল। 'ঘরে-বাইরে'র গার্হস্থ্য জীবনচিত্রণে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী যুগের অভিজাত বাঙালির গৃহের এই দ্বন্দ্বক্ষয়ময় রূপটাকে বেশ বিশ্বস্ততার সঙ্গেই বিধৃত রেখেছেন। বিমলার শ্রীঅঙ্গে জরির পাড় দেওয়া হাত-কাটা জ্যাকেট দেখে তার মেজ জা'র কটাক্ষ, সন্দীপের সঙ্গে নির্বাধ মেলামেশায় বাধা দিতে বৈঠকখানার প্রবেশপথে ননকু দাবোয়ানকে নিয়োগ করা, নন্‌কুকে দিয়ে সন্দীপকে বাধাদান, মেজ-জার স্বদেশী সাবান ব্যবহারকে কেন্দ্র করে জমিদার বাড়ীর অভ্যন্তরীণ অবিশ্বাস ও ঈর্ষাকুটিল রূপটাকে উজ্জ্বলতা দিয়েছেন লেখক। অভিজাত পরিবারের শিক্ষিতা নারীর স্বামী-ভিন্ন অন্য পুরুষের সংস্পর্শে এসে গৃহে বদ্ধ অবস্থাতেই আরক্ত রূপান্তরের জৈব সত্যটাও উপন্যাসটাকে অভিজাত বাঙালির তৎকালীন জীবনের গার্হস্থ্য জীবনরূপের বিশ্বস্ততায় নিয়ে গেছে। জায়েদের সঙ্গে বিমলার গার্হস্থ্য দ্বন্দ্বের মর্মমূলে যে বহিঃস্থ পুরুষ সন্দীপের প্রভাবাচ্ছন্নতা একমাত্র সত্য, কোন বিশেষ রাজনৈতিক বা স্বাদেশিক বোধোন্মেষ নয়, এটা নিখিলেশ

বুঝে যায় সুখসায়রের হাট থেকে বিলিতি জিনিস বের করে দেবার অনুযোগের সঙ্গে বিমলার সাজগোজ ব্যবহার কবাব দৃষ্টিকটু প্রয়াসে। বড়রানী আর মেজোরানীর প্রতি স্বামী নিখিলেশকে ভুলিয়ে ফাঁকি দিয়ে টাকা নেবার সন্দেহে বিমলার ঈর্ষাকাতরতার ছবি তৈরিতেও অভিজাত বাঙালির গার্হস্থ্য রণরঙ্গকে বিশ্বস্ত রূপ দেবার প্রয়াস। কিন্তু সেটাও ফেঁসে যায় যখন দেখা যায়, স্বদেশী সঙ্ঘাতের ঘনঘটা বাড়াব সঙ্গে সঙ্গে রক্ষণশীল জমিদারবাড়ীর এই দুই বিধবা কোন আশ্চর্য মন্ত্রবলে অন্তর্হিত হয়েছে। এমনই তাদের অন্তর্ধান যে, সেই অবসরে বাড়ীর অন্দরমহলে ঢুকে সন্দীপ বিমলার 'খুব কাছে গিয়ে তার হাত চেপে' ধরার নিভৃতি পেয়েছে। এ নিভৃতির ক্ষণ এতটাই প্রলম্বিত যে বিমলা হাত ছাড়িয়ে নেয়নি, দাঁড়িযে থেকেই 'থরথর' করে কেঁপে উঠে সন্দীপ চৌকিতে বসিয়ে দেওযা পর্যন্ত দাঁড়িয়েই থেকেছে! আজ থেকে প্রায় একশো বছব আগে বাংলা নভেলে তৎসাময়িক কালের এই বিলোল কল্পচিত্র দেখেই সম্ভবত সমালোচক যতীন্দ্রমোহন সিংহ লেখেন, "কবি অবশ্যই স্কুল মাষ্টারি করিতে বসেন নাই এবং তাঁহাব নিকট আমরা কোন উচ্চ শিক্ষার আশা করি না। কিন্তু এই পুতিগন্ধময় কাব্যরচনা করিয়া সমাজের নৈতিক বায়ু কলুষিত করিবার তাঁহার কোন অধিকার আছে কিনা ইহাই সুধীগণের বিবেচ্য।" সৃষ্টির অন্তঃসারের মর্মনিহিত পরিহাস যে; সন্দীপ-বিমলার জৈব আচরণের নড়াচড়া যতটুকু দেখানোর কারণে রবীন্দ্রনাথ পূর্বোক্ত সমালোচনায় বিদ্ধ হ'ন তৎকালে, কালব্যবধানে ১৯৯৬ সালে বাঙালির কাছে সেটাই হয়ে যায় তাঁর "ব্রাহ্মিক শুচিতা তথা ভীরুতার"[১৯] অভিজ্ঞান! তত্ত্বের প্রয়োজনে সৃষ্ট চরিত্ররা যদি হয় স্রষ্টারই মনের বহুখণ্ডিত প্রতিরূপ তাহলে তা কৃত্রিম হতে বাধ্য। সে কৃত্রিমতাকে সমকালের রঙ ছুপিয়ে কিছুটা হয়তো ঢাকা যায়, কিন্তু সেই কালের সঙ্গে সংস্পৃষ্ট কবিমনের আহত আসক্তি-পক্ষপাত যখন উন্মোচিত হয়ে যায়; তখন সৃষ্টির মর্মনিহিত সারগ্রাহিতাই প্রশ্নের মুখে পড়ে যায়। 'ঘরে-বাইরে'র স্রষ্টা এই নেতি নিজেই তৈরি করেছিলেন তাঁর সৃষ্টিসামর্থ্য প্রযোগের মধ্যে। তাই তাঁর আহত ও সঙ্কুচিত মনের বাঁকাচোরা ছাঁচে গড়া সন্দীপকে কখনও কোনও পাঠকের যদি মনে হয় যে এ সন্দীপ নয়; নিখিলেশের লেখা 'সন্দীপেব আত্মকথা' (বিশেষত ৩ নং আত্মকথা), তখন ওই আত্মকথাব গার্হস্থ্য রণরঙ্গের পটটাকেও তার আকৃতি এবং রং সমেত ঝুটো মনে হয়। কঠিন হলেও 'ঘরে-বাইরে' সম্পর্কে এই সত্যটা উচ্চারণ করতেই হবে।

## ।। উল্লেখপঞ্জি ।।


১. "নভেলে ববীন্দ্রনাথ", 'বরিশাল হিতৈষী' পত্রিকায ১৩২৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত প্রবন্ধ, লেখক অনুল্লেখিত।

২ "টীকাটিপ্পনি", সবুজপত্র অগ্রহায়ণ ১৩২২। 'ঘরে-বাইবে'ব গ্রন্থপরিচয থেকে পবিগৃহীত।

৩. 'ববীন্দ্রনাথ . কথাসাহিত্য', নিউ এজ পাব. প্রা.লি, তৃতীয় সংস্করণ মে' ১৯৬২, পৃ ৮৬

৪. বুদ্ধদেব বসু 'রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য', প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬-৮৭

৬. 'কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ', 'মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা.লি ' চতুর্থ মুদ্রণ ১৩৮০, পৃ. ৮৮

৭. 'ভারতবর্ষ : দিনপঞ্জী-১৯১৫-১৯৪৩', রমাঁ রলাঁ, অনু. অবন্তীকুমার সান্যাল, 'সারস্বত লাইব্রেরী', পৃ. ৮৬-৮৭

৮. 'ভারতবর্ষ : দিনপঞ্জী-১৯১৫-১৯৪৩', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭১

৯. ''রবীন্দ্রনাথের গান্ধীবাদী উপন্যাস ঘরে বাইরে'', জর্জ লুকাচ, অনুবাদ : দীপক রায়, 'ম্যানিফেস্টো', সম্পা পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়/প্রদীপ গোস্বামী, জুন' ১৯৮৩, পৃ ৫৪-৫৮। (প্রবন্ধটা সহজপ্রাপ্য নয় এবং হয়তো এখনও বহুলপ্রচারিতও নয়-তাই এত বেশি পরিমাণে উদ্ধৃতি দেওয়া হল, বিরক্তি সঞ্চারের জন্য নয়)।

১০. ''রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস'', হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, 'রবি-প্রদক্ষিণ', সম্পা : চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, 'বসুধারা প্রকাশনী' ৪২ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট-কলকাতা ৬, আষাঢ় ১৩৬৮, পৃ. ৩২১-৩২২

১১. ১ নভেম্বর ১৯০৭

১২. ''বাঙালির ব্যবসা-বাণিজ্য'', চিত্তব্রত পালিত, 'দৈনিক স্টেটসম্যান' ২৫.১১.২০০৭ ও ২.১২.২০০৭, পৃ. ৪

১৩. 'রবীন্দ্র কথাসাহিত্য : উপন্যাস', শুকদেব সিংহ, 'এ.কে.সরকার এ্যান্ড কোং, ১৩৮৯, পৃ. ২৮-২৯

১৪. চিত্তব্রত পালিত, ''বাঙালির ব্যবসা-বাণিজ্য'', 'দৈনিক স্টেটসম্যান' ২৮.১০.২০০৭, পৃ. ৪

১৫. চিত্তব্রত পালিত, প্রাগুক্ত, ২৫.১১.২০০৭, পৃ ৪

১৬. 'রবীন্দ্রজীবনী' প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৩২

১৭. 'চিঠিপত্র ৫, পত্র সংখ্যা ২৯

১৮. বিশ্বজীবন মজুমদার, 'রবীন্দ্র উপন্যাস : দেশ ও কাল', পপুলার লাইব্রেরী' ১৯৮১, পৃ. ১৮০

১৯. ''বিষবৃক্ষ নষ্টনীড় ঘরে বাইরে'', গুণময় মান্না, 'জিজ্ঞাসা' বৈশাখ-আষাঢ় ১৪০৩, পৃ. ৯৪

---

প্রবন্ধটির প্রথম প্রকাশ জুন' ২০০৮

"লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি মৌলিক,

যুক্তি ও বিশ্লেষণ প্রখর

এবং

ভাষা সমর্থ।

এঁর বক্তব্যের সঙ্গে সকলে একমত না হলেও

তা অনুধাবনযোগ্য

এবং

তা প্রকাশিত হলে স্বাস্থ্যকর বিতর্কের

একটি পরিসর সৃষ্টি হবে।"